রসুল গীতা
শ্রী দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রসুল-গীতা

শ্রী দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
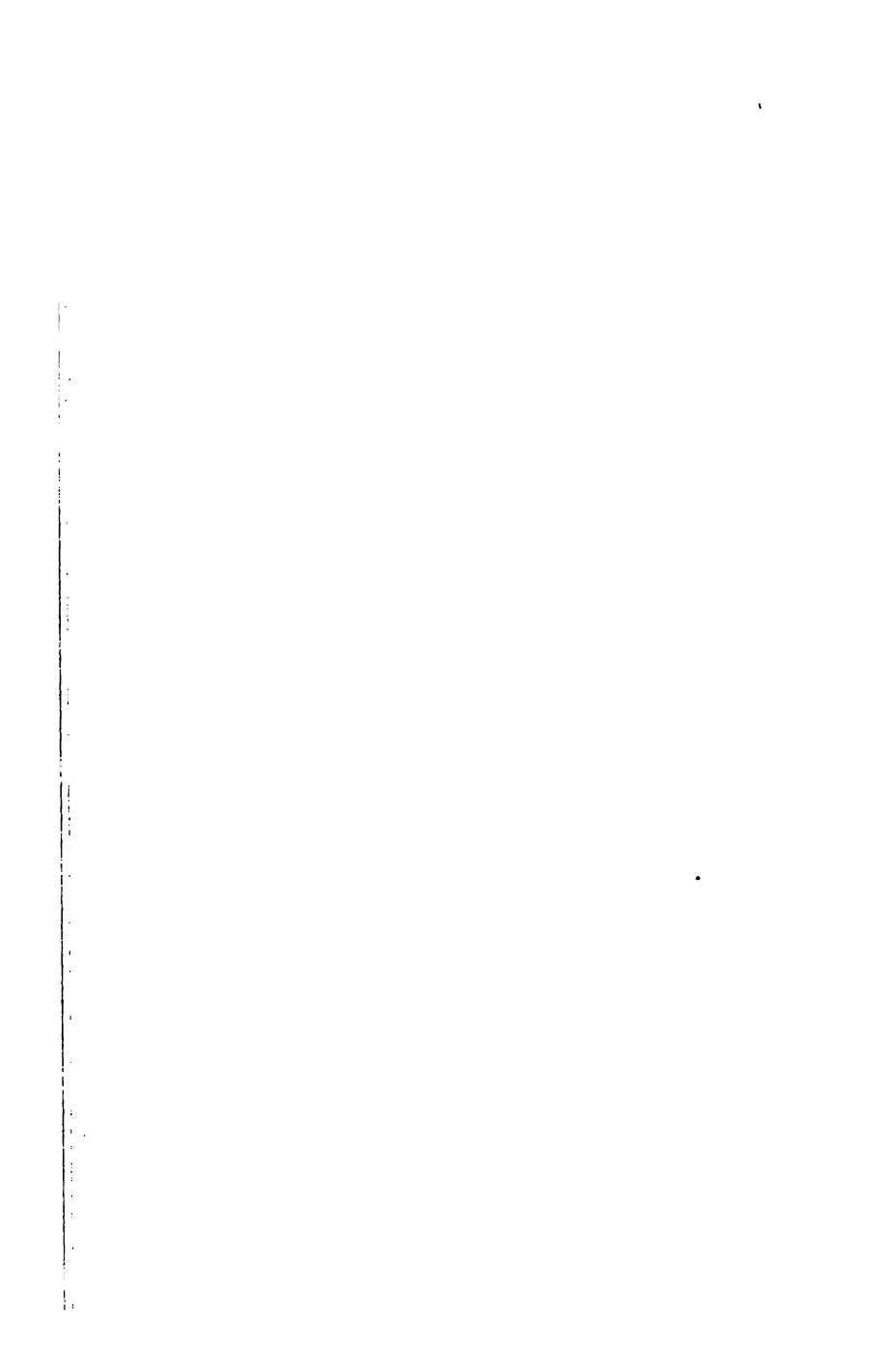
অবতরণিকা

ইং ১৯৬১ সালে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এই দীন সেবককে যে বিরাট কাজটি করতে আদেশ করেন তা' হ'ল, কোরানের আয়াত অবলম্বন ক'রে দেখাতে হবে যে, কোরানের বাণীর সাথে সনাতন আর্য্য ভাবধারার মূল বক্তব্যের কোথাও বিরোধ নেই। আজ ভাষ্য-টীকার অপরিচ্ছন্ন জঙ্গলে প'ড়ে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু দেখা ও বোঝা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। সেইজন্য পরম-শ্রেয় সেই প্রেরিত পুরুষদের বাক্য ও আচরণের মধ্যেও আমরা ভেদ করতে আরম্ভ করেছি। ফলে, সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক অসহযোগ ও মনগড়া মতদ্বৈধতা এবং তার থেকে জন্ম নিয়েছে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ। প্রেরিতপুরুষগণের বাণী ও ভাবধারার মধ্যে সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেই এমনতর একটি গ্রন্থ রচনা করতে আদেশ করেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কোরানে গীতা, গীতায় কোরান, গীতায় বাইবেল বা বাইবেলে গীতা—এই ধরণের বই শ্রীশ্রীঠাকুর এক সময় চেয়েছিলেন। সেকথা তিনি ভক্তবৃন্দের কাছে ব্যক্তও করেছিলেন। "ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ একই বার্ত্তাবাহী" এবং প্রেরিতধারার সাম্প্রতিকতম বিবর্ত্তন স্বয়ং তিনি যে পূর্ব্ববর্ত্তী সবারই আপূরক, একথা নিশ্চয়াত্মকরূপে প্রমাণ করবার জন্যই তাঁর অমনতর গ্রন্থের আকুলতা।

জানি না, প্রভুর ইচ্ছা কতখানি পূরণ করতে পেরেছি। তবে ইং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল, এই ছয়টি বছর অতন্দ্রভাবে চেষ্টা করেছি তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে। দিনে-রাতে প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ বিষয়ে পড়াশুনা ও লেখার প্রেরণা সঞ্চার ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে তাতিয়ে

মাতিয়ে রাখতেন। চব্বিশটি ঘন্টার মধ্যে দু'তিনটি ঘন্টা থাকত নিজের স্নান-আহার-বিশ্রামের জন্য। বাকী সবটুকু সময়ে তিনি আমাকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন তাঁর ঐ কর্ম্মসম্পাদনের জন্য। আমার ক্ষুধা, তন্দ্রা, আলস্য সবই যেন তিনি টেনে নিয়েছিলেন! আর, আমার মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন অফুরন্ত চিন্তা ও কর্ম্ম-শক্তি। ফলে মস্তিষ্কের কোষে কোষে তদ্‌বিষয়ক ভাবনা ও ছবি নিরন্তর জেগে থাকত। সে এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অবস্থা! পরিস্থিতি এমন পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, কোনদিন হয়তো গভীর রাত পর্য্যন্ত কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি। তারপর ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি ইসলাম ও কোরান সম্বন্ধে, পাঠ করেছি পবিত্র কালেমা। আবার কোনদিন দেখেছি, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রস্তুতি। এ একদিন নয়, বহুদিন। সাথে সাথে উপলব্ধি করেছি, আমার সর্ব্বেশ্বর দয়াল ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র প্রতিক্ষণে সঙ্গে থেকে স্বহস্তে আমাকে চালনা করেছেন। আর, তা' না করলে পরমপুরুষের বাণীকে এভাবে সু-সংগ্রথিত ক'রে প্রকাশ করা আমার মত সীমিতবুদ্ধি মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ঐ তুলনামূলক বিরাট গবেষণা-গ্রন্থের সজ্জাটি এইরকম। প্রথমে আছে কোরান-শরিফের আয়াত (বঙ্গানুবাদ), তারপর তার সমর্থনসূচক আর্য্যশাস্ত্রের বাণী (সংস্কৃত) এবং তার নীচে উভয়ের সমন্বয়কারী ব্যাখ্যা (বাংলায়)। যেখানে সমন্বয় সাধন করা আমার পক্ষে কঠিন ব'লে মনে হয়েছে, সেই জায়গাগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপস্থাপিত করেছি। তিনি স্বয়ং আয়াতগুলির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবং কিভাবে হজরত রসুলের (সঃ) উক্তি অন্যান্য প্রেরিতপুরুষের বচনের সাথে সঙ্গতিশীল তাও নিজেই

ব'লে দিয়েছেন। আমি তদনুযায়ী ব্যাখ্যা লিখেছি। ব্যাখ্যা লেখার পর ঠিক হ'ল কিনা তা' আবার তা'কে প'ড়ে শুনিয়েছি। শোনার পরে অনেক জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং সংশোধন ক'রে দিয়েছেন। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে বক্তব্য যাতে সুপরিস্ফুট হয় তার জন্য পুরো বাক্যটিই ব'লে দিয়েছেন। কারণ, একথা তো ঠিকই যে কথাগুলি যাঁর নিজের, তিনিই তো তার প্রকৃত তাৎপর্য্য উদঘাটিত করতে পারেন। বলতে পারেন প্রতিটি বচনের উদ্দেশ্য, অভিধেয় ও প্রয়োজন। তাই, ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে তাঁর কথাগুলি যেমন শুনেছি, ঠিক সেইভাবেই লিখে রেখেছি।

এই মহাকার্য্য করতে যেয়ে যেমন ইসলাম শাস্ত্রের গভীরে অবগাহন করতে হয়েছে, ঘাঁটতে হয়েছে হাদীস শরিফ, শরিয়তের নানা অধ্যায়, তেমনি আর্য্যশাস্ত্রের বৈদিক যুগ থেকে শুরু ক'রে পৌরাণিক যুগের সর্ব্বশেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ প্রেরিত পুরুষোত্তমদের বাণীরাজি, অবধান-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করেছি। সংস্কৃত ভাষায় উল্লিখিত আর্য্যশাস্ত্রের কোন শ্লোক যখন কোরানের কোন আয়াতের সঙ্গে সমার্থক ব'লে মনে হয়েছে, তখনই ঐ শ্লোকটি সেই আয়াতের পাশে লিখেছি। তার নীচে লিখেছি সমন্বয়কারী ব্যাখ্যা। সমস্ত কাজটি শেষ করতে আট নম্বুরী একসারসাইজ বুকের সতেরখানা খাতা লেগে গেছে।

ঐ গ্রন্থ রচনার কালে কোন কোনদিন হয়তো রাত একটা কি দুটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আমার ঘরে কাউকে পাঠিয়ে দিতেন। ব'লে দিতেন, "দেখে আয় তো দেবী কী করছে। যদি লিখতে থাকে, তাহ'লে কিছু বলবি না। চুপি চুপি দেখে চ'লে আসবি।" এখন, সে-লোক আমার ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়াতেই আমার লক্ষ্য পড়েছে। তার

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেছি। সে তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ কথাগুলি জানিয়ে মুচকি হেসে ফিরে গেছে দয়ালের কাছে। বলেছে সব কথা। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে যেতে তিনি নিজেই প্রসন্ন অন্তরে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত ক'রে বলেছেন, "কাল রাতে ঘুম আসছিল না। তাই, তুই কী করছিস্ দেখার জন্য ওকে পাঠিয়েছিলাম। লেখা এগোচ্ছে তো ? আমি "হ্যাঁ" বলতেই খুশী হয়েছেন তিনি।

এইভাবে প্রতিনিয়ত আদর, সোহাগ ও অমোঘ-সঞ্চারী প্রেরণার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব করেছেন তিনি তাঁর এই দীনাতিদীন সন্তানকে দিয়ে। তাই, আমার প্রতিমুহূর্ত্তের স্থির বিশ্বাস, একমাত্র তিনিই পারেন অঘটন ঘটাতে, অসাধ্য সাধন করতে। তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান।

লেখার ফাঁকে মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠাতেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কাছে গেলে জিজ্ঞাসা করতেন রসুলাল্লার (সঃ) জীবন ও আচরণ সম্বন্ধে। রসুলাল্লা (সঃ) যে খাদ্য হিসাবে যবের রুটি, খেজুর, মধু পছন্দ করতেন, সেকথা বিশেষভাবে বলতেন। তিনি ছিলেন সবার আশ্রয়স্থল, পরমপ্রেমিক, এক-ঈশ্বরবাদের পরম উদগাতা, এসব কথা অনেক রকম গল্প ক'রে শোনাতেন। যখন যে কাহিনীটি নিজে বলতেন, তা' আবার হজরতের (সঃ) জীবনী থেকে খুঁজে বের করতে বলতেন। বের ক'রে যখন তাঁকে কাহিনীটি প'ড়ে শোনাতাম, শ্রীশ্রীঠাকুর আহ্লাদে যেন আটখানা হ'য়ে পড়তেন।

কখনও আবার জিজ্ঞাসা করতেন ইসলাম, আল্লা, হজরত প্রভৃতি শব্দের অর্থ। আভিধানিক অর্থই বলতাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "আল্লা উপনিষদ্ নামে একটা উপনিষদ্ আছে

শুনেছি। দেখিস্ তো পাওয়া যায় নাকি !" একথা শুনে হেসে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম 'আল্লা' আরবী শব্দ, আর 'উপনিষদ্' হ'ল সংস্কৃত শব্দ। এই দুটি মিশিয়ে হয়েছে 'আল্লা-উপনিষদ্'। এ আবার কেমন কথা ! শ্রীশ্রীঠাকুর কোরান ও আর্য্য ভাবধারার মধ্যে সঙ্গতিসাধন করতে চান। তার জন্য বোধ হয় এমন ধরণের হাস্যকর ভাবনা পর্য্যন্ত করছেন। আল্লা-উপনিষদ্ নামে কি কোন বই হ'তে পারে ? কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র মন্থন করতে যেয়ে সে ভুল ভাঙ্গল। দেখা গেল, অথর্ব্ব-বেদেরই একটা অংশ আছে, তার নাম 'আল্লোপনিষদ্'। সেখানে 'আল্লা' বলতে ঈশ্বরকেই বোঝানো হয়েছে। অল্ + লা অর্থাৎ যিনি সব কিছু দান বা গ্রহণ (লা) করেন। আরো পরিষ্কার ক'রে বলা যায়—যিনি সর্ব্বপ্রদাতা বা সর্ব্বগ্রহীতা। তিনিই তো ঈশ্বর।

আবার একদিন হজরত শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। অভিধানগত অর্থই বললাম—যিনি সবসময় ঈশ্বর-সন্নিধানে হাজির থাকেন তিনি হজরত (আরবী 'হাজের' থেকে)। শ্রীশ্রীঠাকুর এক নতুন দিক দিয়ে শব্দটির অর্থ ক'রে বললেন, "যিনি নিত্য হজে রত, এরকম্ অর্থ হয় না ?"

আবার, ধর্ম্ম শব্দটির মানেই যে দিনের মধ্যে কতবার জিজ্ঞাসা করতেন তার অন্ত নেই। একই কথার অর্থ নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জানতে চাইতেন। বুঝতে পারতাম না তাঁর এমনভাবে জিজ্ঞাসা করার কারণ কী ? পরে বুঝেছি, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি শব্দকে যেন আমরা ভালভাবে বুঝে রাখি এবং কিছুতেই ভুলে না যাই, তারই জন্য তাঁর এই অক্লান্ত প্রচেষ্টা। বার বার দেখেছি, শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুসন্ধিৎসার

জোগান দিতে যেয়ে মানুষের জানা ফুরিয়ে যেত।

কোরান-শরিফ ও হজরত রসুল (সঃ) সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে। সেই আলোচনার প্রেক্ষাপটেই বর্ত্তমান পুস্তিকার অবতরণ। কোরানের সাথে আর্য্যশাস্ত্রের যে তুলনামূলক সমালোচনাটি (Comparative study) তিনি দয়া ক'রে তাঁর এই দীন সন্তানকে দিয়ে লিখিয়েছেন, তার নামকরণ দয়াল ঠাকুর স্বয়ং করেছেন "বেদদীপ্ত কোরান-শরিফ"। বাস্তব কিছু অসুবিধার জন্য সে মহাগ্রন্থ বর্ত্তমানে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কিন্তু সে গ্রন্থের আবির্ভাবের পশ্চাৎপট, তার বিষয়বস্তু ও সজ্জার একটা পরিচিতি সর্ব্বসাধারণে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের শেষভাগে নিবেদিত হ'ল ঐ গ্রন্থের একটা পরিচায়িকা।

এই পুস্তিকাটির নাম 'রসুল-গীতা'। রসুল অর্থ প্রেরিতপুরুষ এবং গীতা মানে গান, কথন। প্রেরিতপুরুষ তথা ঈশ্বরাবতারদের বাণী ও ভাবধারার মধ্যে যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই, তাঁদের সকলের কথার সুরই এক, কালের দ্বারা তাঁরা অবচ্ছিন্ন নন, তা'ই হ'ল এ পুস্তিকার বিষয়বস্তু। তাই নাম 'রসুল-গীতা'। এই ক্ষুদ্র পরিসরে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করতে। কতটা সফল হয়েছি সে-বিচারের ভার সহৃদয় পাঠকবৃন্দের হাতে।

আজ ব্যক্তিস্বার্থ ও দলবাজির হানাহানি যেভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র তথা মনুষ্যত্বকে সঙ্কীর্ণ ও অধঃপতিত করছে, তাতে এই গতি এখনই রুদ্ধ না হ'লে অচিরে এক অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ আমাদের গ্রাস করবে।

পরমপিতা পরম দয়াল। তিনি চান মানুষ তাঁকে ভালবাসুক, পরিচ্ছন্ন বোধে উপনীত হ'য়ে স্বস্তি ও শান্তির অধিকারী হোক, সেই বার্ত্তা নিয়ে কলির শেষ যামে আবির্ভূত হয়েছেন পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। বর্ত্তমান পুস্তকটি ক্ষুদ্র হ'লেও তাঁরই আশীর্ব্বাদের একটি প্রসূন। যদি এই পুস্তিকা পাঠ ক'রে মানুষের মনে স্বচ্ছ বোধের উদয় হয়, প্রেরিতপুরুষগণের প্রতি ভাবভক্তি জাগ্রত হয়, সম্প্রদায়গত সমস্যার ক্ষীণ সমাধানী-সূত্রও যদি এতে মেলে, তাহলে আমার এ প্রচেষ্টা ধন্য হবে।

বিনীত—
শ্রী দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মনোমোহিনী ধাম
সৎসঙ্গ
দেওঘর

ইং ২১।৫।১৯৮২
বাং ৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার
১৩৮৯

সূচীপত্র

বিষয়—		পৃষ্ঠা—
১। ইস্লামের গোড়ার কথা	—	১
২। সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা	—	১৪
৩। কোরান-দীপ্তি	—	২৩
৪। দয়ালগুরু ও ইস্লাম	—	৪১
৫। বেদদীপ্ত কোরান-শরিফের পরিচায়িকা	—	৫৬
৬। কোরান-শরিফ রত্নাচলের কয়েকটি রত্ন	—	৬৩

ইসলামের গোড়ার কথা

আরবী-ভাষায় 'সালাম' মানে শান্তি। 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' এই শব্দদ্বয়ও ঐ সালাম-দ্বারা গঠিত। সেইজন্য, ইসলাম শান্তির ধর্ম্ম; আর মুসলিম—সেই শান্তির ধর্ম্মের অনুগমনকারী, ঈশ্বরে আত্মনিবেদনকারী। একজন প্রকৃত মুসলমান যিনি, তিনি শান্তিরই বার্ত্তা বহন করেন। পরস্পর সাক্ষাৎ হ'লে মুসলিমের প্রথম উক্তি হয়—'আস্-সালাম আলায়কুম' অর্থাৎ আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আবার, কোরান-শরিফেরও অনুজ্ঞা—কোন গৃহে উপস্থিত হ'লে সেই গৃহের অধিবাসিগণের প্রতি শান্তিবাণী উচ্চারণ করতে হবে। শান্তিই ইসলামের মূলমন্ত্র। সেইজন্য, সকল শান্তির একমাত্র আধার, শান্তির পরম আশ্রয়, পরমেশ্বরের বহু নামের মধ্যে একটি 'আস-সালাম' অর্থাৎ শান্তির উৎস। আবার, স্বর্গধামকেও কোরান-শরিফে বলা হ'য়েছে 'দার-উস-সালাম' অর্থাৎ শান্তির আবাস বা শান্তি নিকেতন।

এই কথাগুলির ভিতর-দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের মূল কোন্ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই যে শান্তি ইসলামের মূল, এ কিন্তু নিথর শান্তি নয়। শুধু মুখে-মুখে শান্তির বাণী উচ্চারণ করাকে ইসলাম কখনও বড় ব'লে মনে করে না। মুখে হয়তো একেশ্বরবাদ বা সালামধ্বনি খুব উচ্চারিত হ'চ্ছে, কিন্তু অন্তর বেইমানী ও কপটতায় পরিপূর্ণ, তেমনতর ব্যক্তি মুসলিম ব'লে পরিগণিত হয় না। ইসলাম সক্রিয় শান্তির কথা বলে। যার হাত এবং জিহ্বা থেকে প্রতিবেশী উৎপীড়িত হয় না, চরিত্র যার উন্নত, যে অপরকে কটু কথা বলে না, যে মনে-মুখে অকপট এবং সর্ব্বোপরি যার চিত্ত সতত চির-সুন্দর আল্লাহ্ তা'লারই ভাবভূমিতে সংস্থিত, সে-ই যথার্থ মুসলিম। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ইসলাম পুনঃপুনঃ

সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অসৎকর্ম্ম বর্জ্জন করার কথা বলেছেন। কারণ, কোরান-শরিফে ঈশ্বরকে নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, প্রতিফল-বিধাতা ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। কল্যাণের তিনি প্রভু। আবার অকল্যাণ যা'-কিছু ঘটে, তাও হয় তাঁরই শিষ্ট বিধান অবজ্ঞা করার ফলে। এই সৎস্বরূপ ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হ'য়ে ওঠার জন্যই মানুষকে অন্তরে-বাহিরে সৎ হ'য়ে উঠতে হবে।

সংস্কৃত সাহিত্যেও 'শান্তি'-শব্দের অর্থ যাতে সমতা রক্ষিত হয়। মনের শান্তি মানে মনের অবৈকল্য-অবস্থা লাভ করা। পারিপার্শ্বিকের আঘাত-ব্যাঘাত যতই আসুক না কেন, চিত্তের স্থৈর্য্য এবং সাম্য যদি বিঘ্নিত না হয়, তবেই শান্তি লাভ হয়েছে বলা যেতে পারে। এই চির-অবৈকল্য-অবস্থা লাভের জন্য আমাদের সত্তার আবেগের একটা শক্ত আলম্বন প্রয়োজন। পার্থিব বস্তুনিচয়ের কোন-কিছু যদি এই আলম্বন হয়, তবে তাতে অসুবিধা আছে। কারণ, জাগতিক সকল পদার্থেরই জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি ও ক্ষয় আছে। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লা যিনি, পরমপিতা যিনি, পরমেশ্বর যিনি, তিনিই ঐ বৃদ্ধি-ক্ষয়াদির পারে অবস্থিত। তাই, একজন মুসলমানের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্যই হ'ল, এক-ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা, এক পরমপিতার আনুগত্য স্বীকার করা। তিনিই হ'তে পারেন মানবজীবনের একমাত্র অক্ষয় সুদৃঢ় অবলম্বন। একেশ্বরবাদ ইসলামের প্রাণ।

ইসলাম বলে, ঈশ্বরের কোন অংশী করা চলে না। তিনি পূর্ণ, নিত্য, অখণ্ড, এক। সেইজন্য ইসলাম প্রতীক-পূজাকে বর্জ্জন করার কথা ব'লে থাকে। মানুষের অন্তরে যোগাবেগ অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার

আবেগ চিরস্থায়ী। পিতামাতার যোগাবেগের ভিতর-দিয়েই মানুষের জন্ম, সংসারে কোন বিষয়ের সুদৃঢ় যোগাবেগেই মানুষের সংস্থিতি এবং মৃত্যুকালে কোন বিশেষ চিন্তাধারায় যোগাবেগ-নিবদ্ধ হ'য়েই মানুষ এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে। প্রতিপ্রত্যেকের সত্তায় এই আবেগ অর্থাৎ টানই হয় তার চালক, জীবননিয়ামক। এই টানের বস্তু যার যত উন্নত বা অবনত, তার জীবনও তত উর্দ্ধ বা অধোগতিসম্পন্ন। সেইজন্য ইসলাম বলে, মানুষের অন্তরের সবটুকু টান নিবদ্ধ হোক একমাত্র পরমেশ্বরের উপর। সেখানে যেন এতটুকুও ফাঁক না থাকে, একটুও খাঁকতি না হয়। পরমপিতাই হোন মানুষের একমাত্র উপাস্য, স্মরণীয়, ধ্যানগম্য। কোনভাবে এর ব্যতিক্রম হ'লে অংশীবাদিতার পাপ মানুষকে স্পর্শ করে। আর, অংশীবাদটাই মিথ্যা। কারণ, যে-ঈশ্বর সর্ব্বদাই অখণ্ড ও সম্পূর্ণ, তাঁর অংশ স্থির করাই তো যায় না। এই কারণে কোন গাছ, পাথর বা মাটির মূর্ত্তিকে অখণ্ড ঈশ্বর ভেবে উপাসনা করার কথা ইসলাম কখনও বলে না। ইসলাম বলে, সামান্য প্রতীকের মধ্যে অনন্ত, অসীম, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে কখনও সীমায়িত করা যায় না। এই গেল একদিকের কথা।

আবার, যদি কোন মুসলমান বাইরে প্রতীকপূজা বর্জ্জন করে, মুখে ইসলামের মতবাদ স্বীকার করে, অথচ অন্তরে কাম-কামনার দাহ নিয়ে প্রবৃত্তি-অভিমুখী হয়ে চলে, সেও কিন্তু অংশীবাদিতার দোষে দুষ্ট। সে প্রতীক-পূজা করে না ঠিকই; কিন্তু তার অন্তর-আসনেও সে পুরাপুরি খোদাতালাকে প্রতিষ্ঠিত করেনি। সেখানে তার খোদমালিক কোন বিশেষ প্রবৃত্তি বা কামনা, পরমপিতা নন। প্রতীক-পূজা ত্যাগ করা বা তার

বিরুদ্ধাচরণ করা খুব কঠিন নয়। সামান্য চেষ্টাতেই মানুষ তা' পারে। কিন্তু সমগ্র তনু-মন-ধন একমাত্র পরমপিতার সেবাতেই নিয়োজিত ক'রে, জীবনে তাঁকেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা শক্ত এবং অতীব শক্ত কাজ। আর, মানুষ যতক্ষণ সকল বাসনা-কামনার আকর্ষণ পরিত্যাগ ক'রে, মনে-মুখে, ভাবায়-বলায়-করায়, সর্ব্বতোভাবে এক-ঈশ্বরকেই জীবন-সর্ব্বস্ব ক'রে না তুলেছে, ততক্ষণ ইসলামের পরিভাষায় সে প্রকৃত মুসলমান নয়।

মুখে এক কথা ব'লে, মনে অন্যরকম পরিকল্পনা নিয়ে যারা চলে, তাদের বলা হয় কপট। তারা সরল অন্তঃকরণের লোক নয়। এই সব কপটাচারীদের সংস্রব বর্জ্জন করার কথা কোরান-শরিফে পুনঃপুনঃ আছে। এদের সান্নিধ্যও মহাক্ষতিকর। এরা নিজেরা মানসিক অসুস্থ; তাই, যাদের সন্নিধানে যায়, তাদেরও অসুস্থ ক'রে তোলে। এরা মুখে এক-ঈশ্বরের কথা বললেও, অন্তর এদের ঈশ্বর-ভাব-বিহীন। এদের অন্তরে দেবতার আসন অধিকার ক'রে থাকে কোন বিশেষ রিপু বা কামনা। এইভাবে কপটাচারীরা সর্ব্ব-উদ্ভাসনকারী ঈশ্বরজ্যোতিঃ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। কামনার পুরু আস্তরণে তাদের অন্তর থাকে আচ্ছাদিত; তাই, সেখানে মহিমময় পরমেশ্বরের কল্যাণ-কিরণ প্রবেশ করতে পারে না। এইভাবে যারা তাদের অন্তঃকরণ পরমপিতার দিব্য আলোকচ্ছটা থেকে আবৃত ক'রে রাখে, ইসলাম তাদের আখ্যা দিয়েছে—'কাফের'। আরবী ভাষায় 'কুফ্র'-ধাতুর অর্থ—আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা; 'কুফ্র' থেকে 'কাফের'। এই অর্থে কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতি কাফের নয়। যারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাঁর বিধানের বহির্ভূত চলনে চলে, তাদেরই কাফের বলা যায়।

ঈশ্বরকে কোরান-শরিফে 'আল্লাহ্' নামে বলা হ'য়েছে। অনুরূপ 'অল্লা'-শব্দ সংস্কৃত-ভাষাতেও দেখা যায়। 'অল্' মানে পর্য্যাপ্তি এবং লা-ধাতু মানে গ্রহণ। যিনি এই পর্য্যাপ্তি অর্থাৎ বিপুলত্বকে গ্রহণ ক'রে আছেন, সব-কিছুরই আশ্রয় যিনি, তিনিই 'আল্লা' (আল্লাহ ?)। তিনিই সবার 'খোদ' অর্থাৎ প্রধান মালিক; তাই তিনি 'খোদা'। কোরান বলছেন, তিনিই জীবজীবনের পরম অবলম্বন, শ্রেষ্ঠ আরাধ্য, মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়, সর্ব্বপ্রভু, সর্ব্বপ্রদাতা, করুণাময়। এই নিরাকার শাশ্বত চৈতন্য-সত্তার বোধ সাধারণ প্রবৃত্তিমার্গী মানুষের পক্ষে হওয়া কঠিন। তাদের কাছে ঈশ্বর ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ যথার্থ ঈশ্বরবোধে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ কখনও প্রকৃত শান্তিলাভ করতে পারে না। তার দৃষ্টিও বিশুদ্ধ হয় না, বোধও স্বচ্ছতা লাভ করে না। সেজন্য প্রতিপ্রত্যেকের ঈশ্বরলাভের পথ সুগম ক'রে দিতে যুগে-যুগে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। কোরান শরিফ বলছেন—

"যে কেহ রসুলের অনুগত হয়, নিশ্চয় সে আল্লারই অনুগত হইয়া থাকে (৪ : ৮০)।"

রসুল অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত যিনি, তিনি ঈশ্বরেরই ভাবাভিষিক্ত দিব্য মানব। তাইতো তাঁর অনুগমনে ঈশ্বরেরই অনুগমন করা হয়। ঈশ্বরলাভের মাধ্যম ঐ রসুল; এই মর্ত্ত্যধামে তিনিই মানবের গুরু—পথপ্রদর্শক। তিনি তাঁর দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, প্রীতি-অনুকম্পা, পারস্পরিকতা-বোধ, সুমিষ্ট ভাষণ প্রভৃতি সদ্গুণের দ্বারা নরকুলকে ঈশ্বরাভিমুখে পরিচালিত করেন। ইসলাম বলে, বিভিন্ন দেশে সমাগত রসুলগণের মধ্যে কোন বিভেদ নেই।

ঈশ্বরবোধে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন—চিত্তসংশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সুনিয়ন্ত্রণ এবং অকপট হয়ে অন্তর-আসনে ঐশী-ভাবের বেদী সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তার জন্য ইসলামের বিশেষ কয়টি নীতি আছে। ঐ নীতিগুলিই ইসলামের স্তম্ভ। সেগুলি হল—কালেমা, নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজ।

'আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ উপাস্য নয় এবং মোহাম্মদই আল্লার রসুল' —এইটিই মূল কালেমা। কালেমা পাঠ ক'রেই ইসলামে দীক্ষিত হ'তে হয়। মুসলমান কালেমাকে মনেপ্রাণে স্বীকার ক'রে নেবেন, কালেমায় সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন। তাছাড়াও মুসলিমকে স্বীকার করতে হয়—ঈশ্বরানুগ সত্যপথের কথা, কর্ম্মফলের কথা এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবনের কথা। এগুলিও আল্লার কালাম (ঈশ্বরের বাণী) এবং মুসলিমের অবশ্য-স্বীকার্য্য।

ঈশ্বরের সমীপে যে নীতি, বিনতচিত্তে যে প্রার্থনা, তাই নামাজ (নমস্ বা নমঃ?)। সারা দিন-রাতে মুসলমানের জন্য পাঁচ বার নামাজের বিধান দেওয়া হয়েছে। ঊষাকালে, দ্বিপ্রহরের অব্যবহিত পরে, বিকালে, সন্ধ্যার পরে এবং রাত্রে—এই পাঁচটি কালে যথাক্রমে ফজর, জোহর, আসর, মগরিব ও এশার নামাজের বিধান। এ-বাদেও নিয়ত ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন ভক্ত মুসলমানগণ গভীর রাত্রে আরো একপ্রকার নামাজ করেন, তার নাম 'তাহাজ্জদ'। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এতবার নামাজের বিধান দেবার তাৎপর্য্য, মনে হয়—মানুষকে প্রবৃত্তির পাশ থেকে মুক্ত ক'রে সতত ঈশ্বর-ভাবনায় ভাবিত রাখার ব্যবস্থা করা। নামাজের কালগুলি এমনই ভাবে নির্দ্ধারিত যে, প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ থেকে আরম্ভ ক'রে রাত্রে শয্যাগ্রহণ

পর্য্যন্ত সবটুকু সময়ই মানুষকে হয় কর্ম্মজীবন, নতুবা প্রার্থনাকার্য্যের মধ্য-দিয়ে অতিবাহিত করতে হবে। ফলে, অসৎচিন্তা বা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগই তার থাকবে না। এইভাবে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষ সৎজীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে। হিন্দু ভাবধারারও ঐ-ই কথা। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু বলেন—

"প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।।"

—প্রাতঃকাল থেকে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এবং আবার সন্ধ্যাকাল থেকে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যা' করি, হে জগন্মাতঃ! তা' তোমারই পূজা।

বিশ্বের বোধগ্রাহ্য ও বোধবহির্ভূত কোন বিষয়ই ঈশ্বরের রাজত্বের বাইরে নয়। জীব ও জড়জগৎ-এর সব-কিছুই তাঁরই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাই, মুখে তাঁর প্রতি ভক্তির কথা ব'লেও তাঁরই সৃষ্ট পরিবেশের জন্য যদি বাস্তবভাবে কিছু না করা হয়, তবে ঐ ভক্তি অন্তরে স্থায়িভাবে দানা বাঁধে না। সাড়া-সংগ্রাহী (sensory) ও সাড়া-সংবাহী স্নায়ু-তন্ত্রগুলি (motor nerves) যদি একই ভাবের আলোড়নে সক্রিয় হ'য়ে না ওঠে, তাহ'লে মানুষের চিত্তজগতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে তা' নানারকম মানস বিক্ষিপ্তির সৃষ্টি ক'রে। তাই, ঈশ্বর-ভক্তির বাহ্য বাস্তব প্রকাশ হিসাবে ইসলাম প্রতি-প্রত্যেককে জাকাত প্রতিপালনের নির্দ্দেশ দান করেছেন। মোট আয়ের আড়াই শতাংশ জাকাতরূপে দেয় স্থিরীকৃত আছে। অভাবগ্রস্ত মানুষের অভাব মোচন, অন্নবস্ত্র দান, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণমোচন, দাসগণকে মুক্তিপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যে জাকাতের অর্থ

সবই হ'য়ে দাঁড়ায় একটা প্রাণহীন কর্ত্তব্যের মতন। আর, ঈশ্বরসামীপ্যলাভই 'কোরবানী'। আরবী ভাষায় 'কূর্ব্ব'-শব্দের অর্থ নৈকট্য, 'কুরবান' মানে উৎসর্গ, সংযোগ। তাই, 'কোরবানী' মানে তাই যাতে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা যায়। তাঁর ইচ্ছার মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করা যায়, তাঁর সাথে আমার নিত্যযোগ স্থাপিত হ'তে পারে। জীবনকে সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরময় ক'রে তোলাই প্রকৃত 'কোরবানী'। কোরবানীতে উৎসর্গ হয় অর্থাৎ উন্নতিকে (উৎ) সৃষ্টি করা (সর্গ = সৃজ ধাতু) হয়। মানসবৃত্তিগুলিকে যখন সেই এক, অখণ্ড, পরমদয়াল, পরমপিতা, পরমেশ্বরের সেবায় নিয়োজিত ক'রে নিয়ত তাঁরই সর্ব্বপ্রতিপালনী ভাবভূমিতে অবস্থান করা হয়, তখনই কোরবানী বা উৎসর্গ পরিসিদ্ধ হয়। আর সতত এই অভ্যাসের ফলে মানবের দেহ-মন-প্রাণ সেই পরমকরুণাময় বিশ্বভূপের জ্যোতিতে বিভাসিত হ'য়ে ওঠে। এইভাবে নিত্য চেতন সংযোগের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা সামীপ্য লাভ করে। মানবের প্রিয়তম বস্তু যে জীবন, তা' এইভাবেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত (কোরবানী) হ'য়ে পরম সার্থকতা লাভ করে।

ইসলাম কর্ম্মফলে বিশ্বাস করে। ইসলাম জানে, সৎকর্ম্মের ফল শুভ এবং অসৎকর্ম্মের ফল অশুভ। শিষ্টকর্ম্মা সৎ-আচরণশীল মানুষ সুখময় স্বর্গধামে বাস করার অধিকারী হয়, আর, অশিষ্টকর্ম্মকারী অনাচারী মানুষ দুঃখময় নরকানলে নিপতিত হয়। ইসলাম বলে, মৃত্যুর সাথে সাথেই জীবন শেষ হ'য়ে যায় না। মৃত্যুর পরেও একটা অস্তিত্ব আছে, যাকে বলা হয় পরলোক অর্থাৎ পরবর্ত্তী স্থান। ইহলোকের জীবন যার যত সাধু, সুন্দর সুগ্রথিত, তার পারলৌকিক জীবনও অমনি হয়। এক কথায়, ইহজীবনের চলা ও কর্ম্মধারাই মানুষের পরজীবনের গতি ও প্রকৃতি

নির্দ্ধারিণ ক'রে দেয়। সেজন্য, প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসীকে সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা বর্জ্জন ক'রে পবিত্র জীবনপথ গ্রহণ ক'রতে হবে। কোরান-শরিফে এ কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। মানুষ যে মূলতঃ ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট—একথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ঈশ্বরেরই করুণায় মানুষ জীবিত থাকে; তন্মুখী জীবনের অধিকারী হ'লে মৃত্যুর পরে আবার তাঁরই নিকটে ফিরে যায়। এই হ'ল ইসলামের কথা। যাবতীয় পদার্থের সত্তা-সম্বেগরূপে যে ঈশ্বর সব কিছুই পরিব্যাপ্ত ক'রে আছেন, তাঁকে বোধে জাগ্রত করতে হ'লে মানুষকে দেহে-মনে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র ও সৎ হ'তে হবে। অসূয়া, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ, অসংযম প্রভৃতি রিপুর তাড়নাগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করতে হবে। কারো অন্যায়ের জন্য তার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করার চাইতে তাকে ক্ষমা করা—ইসলাম গৌরবজনক এবং পবিত্র-জীবন লাভের সহায়ক ব'লে মনে করে। পরিবেশের প্রতি সদ্ব্যবহার অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্নীতিপরায়ণ হওয়াকে ইসলাম ঘৃণা করে। কথায়-কাজে, খাদ্যে-ব্যবহারে, সেবায়-ব্যবসায়, বসনে-ভূষণে, শাসনে-তোষণে, সর্ব্বত্রই অপবিত্রতা বর্জ্জন ক'রে চলাই ইসলামের সার কথা। সুদগ্রহণ, সুরাপান, বৃথামাংসাদি ভক্ষণ—ইসলামে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। সেজন্য, খাদ্যহিসাবে নির্দ্দিষ্ট করা আছে নানাপ্রকার শাকসব্জী, ফল, তৃণ প্রভৃতি (কোরান ঃ ৮০ তম সুরা দ্রষ্টব্য)। তদ্ব্যতীত অন্যত্র দুগ্ধ, মধু, যব, গোধূমাদিও খাদ্য ও পানীয় হিসাবে গ্রহণ করার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। শারীর ও মানস পবিত্রতা-বিধানের জন্য পুষ্টিকর পবিত্র খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। (তুলনীয় ঃ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি ঃ—হিন্দু শাস্ত্র) তাই, ইসলামে খাদ্যের বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আছে।

ইসলামের এই সমস্ত নীতিবিধির উৎস কোরান-শরিফ। ঐশী-অনুপ্রেরণারূপী জিবরাইলের প্রণোদনায় তৎকালীন ঈশ্বরপ্রেরিত নবী হজরত মোহাম্মদের (তাঁর উপর ঈশ্বরের শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক) শ্রীমুখ থেকে নির্গত হয়েছিল এই কোরান। কোরানের বাণীগুলি অবতীর্ণ হওয়ার সাথে-সাথেই লিখে রাখা হ'ত। পরে এক সময় সবটা একত্র ক'রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। আরবী 'কার্-য়া' ধাতু থেকে কোরান-শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, অর্থ—পাঠের যোগ্য, নিত্য-পাঠ্য। হজরত রসুল (তাঁর উপর ঈশ্বরের শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক) জীবনের শেষ হজ্ (বিদায় হজ্) পালনকালে সমগ্র মুসলিম-সমাজের সম্মুখে যে-আদর্শগুলি গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছিলেন, কোরান-শরিফ তার মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেছিলেন, মুসলিমগণ যদি স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা, আল্লার রসুল এবং কোরানকে তাদের অগ্রভাগে রেখে, তার নির্দ্দেশ-অনুসারে জীবনপথে চলে, তবে তাদের কোনদিন বিভ্রান্ত বা স্খলিত হ'তে হবে না। কিন্তু ঐগুলি বাদ দিয়ে চললেই মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না; তারা তাদের তেজ, বীর্য্য, চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য, সব হারাবে।

হাদিস্‌ও ইসলামের অনেক নীতিবিধির প্রবর্ত্তক। হাদিস্ শব্দের অর্থ—কথোপকথন। হজরত মোহাম্মদ (তাঁর উপরে ঈশ্বরের শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক) বিভিন্ন লোকের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে যে-সব আলাপ-আলোচনা করেছেন, সেগুলিই হাদিস্-রূপে বহু পরে সঙ্কলিত হয়েছে। কোরানের যুগের প্রায় দু'শ বছর পরে হাদিস্-সঙ্কলন আরম্ভ হয়। বহুজনের বহু হাদিস্ আছে। সব হাদিস্ প্রামাণ্যও নয়। জ্ঞানবান্ ভক্ত ইসলাম-অনুরাগিগণ বহু বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে প্রয়োজনীয়তা হিসাবে হাদিস্ গুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই

যে, কোরানই মূল লক্ষ্য। যে হাদিস্ কোরানের বাক্যের অনুপূরক, তাই-ই গ্রহণীয়, অন্যথায় তা' বৰ্জ্জনীয়। কোরান ও হাদিসের এই সম্বন্ধ ভারতীয় আৰ্য্যগণের বেদ ও স্মৃতির সম্বন্ধের ন্যায়। আৰ্য্যগণের বিধান—

"শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।"

—বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে বৈদিক মতই শ্রেষ্ঠ এবং স্বীকাৰ্য্য। তেমনি কোরান ও হাদিসের নির্দ্দেশের মধ্যে সঙ্ঘাত দেখা গেলে সেখানে কোরানই স্বীকাৰ্য্য ও গ্রাহ্য, হাদিস নয়।

আরো গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে—মূলতঃ ইসলামের সাথে আৰ্য্য হিন্দুমতের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বাইবেলের অনুশাসনও এই-ই। প্রবৃত্তিমার্গী মানুষের হাতে প'ড়ে ধৰ্ম্ম বিকৃত হয়, দেবতা ধুক্ষিত হন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ কলহ উপস্থিত হয়। আসলে, ঈশ্বর এক, ধৰ্ম্ম এক এবং প্রেরিতগণ একই বাৰ্ত্তাবাহী। ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন ক'রে মহাকবি গ্যেটের মতই বলতে ইচ্ছা করে—

" If this is Islam, then every thinking man among us is, in fact, a Muslim.

—এই যদি হয় ইসলাম, তবে আমাদের মধ্যে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই একজন মুসলিম।

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

সম্প্রদায়গত সমস্যা আজ পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই কমবেশী রকমে ছড়িয়ে আছে। সম্প্রদায় সঙ্কোচনকেই আমন্ত্রণ করে, প্রসারণকে বিসর্জ্জন দেয়। সম্প্রদায় দলগত প্রাধান্যকেই বড় ক'রে তোলে, মানুষের মনুষ্যত্ব সেখানে অবহেলিত। এক সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থেকে থাকে। তাই, আজ আমরা শুনতে পাই সাদাকালোর বিরোধ, মালিক-শ্রমিক সংঘাত, সর্ব্বহারা-পুঁজিবাদীর সমস্যার কথা।

সম্প্রদায়-অর্থে আমরা মোটামুটিভাবে একটা পৃথক শ্রেণী বুঝি। কিন্তু কোন-কোন ক্ষেত্রে সম্প্রদায়-শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ এত মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করেছে যে তা' আর বলার নয়। যেমন আমরা ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়-শব্দের প্রয়োগ ক'রে থাকি,— অমুক হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোক, অমুক মুসলমান-সম্প্রদায়ের লোক, অমুক খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি। আবার ব'লে থাকি—হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম ইত্যাদি। এগুলিকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ব'লেও বলা হয়।

আমাদের এই ভারতবর্ষের নানারকম সাম্প্রদায়িক সমস্যা আছে। তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা অতি প্রবল। এতই প্রবল, যার ফলে বিরাট ভারত সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গিয়েছিল এক সময়। আজও সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়া মাঝে-মাঝে দেশের কোন-কোন জায়গা পঙ্কিল ক'রে তুলছে। এই বিশেষ সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য।

বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক সময় হয়তো মনে হয়, হিন্দু-কৃষ্টির সাথে বুঝি মুসলিম-কৃষ্টির কোন মিল নেই এবং সেই স্বাভাবিক কারণ বশতঃই এদের মধ্যে বিরোধ জীইয়েই থাকে। কিন্তু এই মনে হওয়াটার কারণ হ'ল অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতাবশেই একজন হিন্দু একজন মুসলমানকে বলবে বিধর্ম্মী, এবং বিপরীতক্রমে একজন মুসলমান একজন হিন্দুকে আখ্যা দেয় কাফের ব'লে। ইসলাম ভারতে আসার পূর্ব্বের বংশগুলির ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যাবে, সবাই একধারার লোক। পরবর্ত্তীকালে যাঁরা ইসলাম-কৃষ্টি গ্রহণ করেছেন, কয়েক পুরুষ আগে তাঁরা একজন হিন্দুর সাথে একই বংশে ছিলেন।

কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করলেও তখনও ভারতবর্ষের লোক সবাই পাশাপাশি থেকেছে, একের বিপদে অন্যে বুক দিয়ে দাঁড়িয়েছে, দেশের বিপদকে সমানভাবেই রুখেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে তখনও তারা আচ্ছন্ন হয়নি। কিন্তু কূটকৌশলী ইংরেজ সরকারের 'Divide and rule' (ভাগ ক'রে শাসন কর) নীতির জালে কিছু স্বার্থবাদী লোক ধরা পড়ল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সরকারসৃষ্ট "মুসলমান এবং অ-মুসলমান" শব্দের আবির্ভাব রাজনীতিতে মেনে নিল। এইভাবে অজ্ঞাতসারে তারা হ'য়ে প'ড়ল সাম্প্রদায়িকতার শিকার। এই দলে প্রভাবশালী যারা ছিল তারা তাদের অনুগত মানুষগুলিকে ঐ চিন্তাধারায় প্রভাবিত ক'রে তুলল। ফলে, সারা দেশে মুসলমান ও হিন্দু দুইটি পৃথক দল ব'লে গণ্য হ'তে থাকল। (দ্রষ্টব্য ঃ Islam and Nonviolence by M. Tayyabulla.)

যে সব "মুসলমান" এবং "অ-মুসলমান" রাজনীতির এই কুটিল

জালে ধরা পড়লেন, তাঁরা সবাই নির্ব্বোধ নন, অশিক্ষিত নন, অভিজ্ঞতাও তাঁদের কম ছিল না। তবুও তাঁরা এমন একটা বিভেদসৃষ্টিকারী আত্মকলহের খেলায় মাতলেন কেন? মাতলেন তার কারণ, তাঁরা ভুলেছিলেন ঈশ্বরকে, খোদাতা'লাকে। ঈশ্বরের আদেশ অবমাননা ক'রে চললেই মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়বেই। আদম ও ইভ্ যখনই ঈশ্বরকে ভুলে গেল তখনই তারা শয়তানের বশীভূত হয়ে পড়ল। স্মরণাতীত কালের ঐ কাহিনী আজও মানুষের মধ্যে লীলা ক'রে চলেছে। আজও সেই পরমকরুণাময়, সর্ব্বমহিমার একমাত্র আধার, সত্তাস্বরূপ ঈশ্বরকে ভুললেই প্রবৃত্তির কবলে পড়তেই হবে। আর, প্রবৃত্তি অজ্ঞানতার সৃষ্টি ক'রে মানুষকে দিয়ে অনেক অঘটন ঘটায়।

প্রকৃত ঈশ্বরবিশ্বাসী যে, সে কখনও প্রবৃত্তির পীড়নে বা অজ্ঞানতার বন্ধনে পড়ে না। জগতের স্রষ্টাকে ভালবাসে ব'লেই তাঁর সৃষ্টির সব কিছুকেই সে ভালবাসে। নিজের জীবনটাকে সে ঈশ্বরের বিধি-অনুযায়ী ক'রেই গ'ড়ে তোলে। ঐশী জ্যোতিঃ তার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হ'য়ে থাকে ব'লে সে হয় সবারই আপন। কাউকে সে ঘৃণা করে না, বর্জ্জন করে না। তথাকথিত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের অনেক ঊর্দ্ধে বিরাজ করে সে। সে ভাগবত মানুষ, আল্লাহ্-তা'লার বান্দা। তাই তার জেহাদ থাকে শয়তানের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মবিরোধী চলনের বিরুদ্ধে। শয়তান তাকে কখনও কাবেজ করতে পারে না। পীর-পয়গম্বর, অবতার-মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে এ-কথা নানাভাবে পাওয়া যায়।

এ-জাতীয় মানুষ ভালভাবেই জানে যে ঈশ্বর এক, তাই তাঁর ধর্ম্মও এক। ঈশ্বর যদি দুই না হন, তাহ'লে তাঁর নীতিবিধি অর্থাৎ সদ্‌ধর্ম্ম

যা' তাই-বা দুই হয় কি ক'রে। ঐশী-চলন যা' অর্থাৎ যে-চলন ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়, ধর্ম্ম তা'ই। আর, এর বিপরীত যা' তাই-ই অধর্ম্ম অর্থাৎ শয়তানের পথ, প্রবৃত্তির পথ। গীতা, কোরান ও বাইবেল যদি আমরা পাশাপাশি রেখে বিচার করি তাহ'লে স্পষ্টই দেখতে পাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রভু যীশুখৃষ্ট এবং রসুলাল্লা হজরত মহম্মদ (সঃ) বিভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন পরিবেশে এই একই কথা বলেছেন। মৌলিকভাবে তাঁদের উক্তির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ নেই।

ঈশ্বরের ধর্ম্ম চিরদিনই এক ব'লে ধর্ম্মের কখনও অন্তর বা ভেদ হয় না। আর, ধর্ম্মের অন্তর হয় না ব'লেই 'ধর্ম্মান্তর' বা 'ধর্ম্মান্তরিত হওয়া' কথাটার উদ্ভব কি ক'রে হয়? বরং সম্প্রদায়-অন্তরিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু ধর্ম্মান্তরিত হওয়া সম্ভব কি? আর, সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ থেকে সর্ব্বব্যাপী, বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের উপাসনা করা মানে তাঁকেও ঐ অতটুকু গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলা। যিনি বিশ্বজগতের অধিপতি, প্রতিপ্রত্যেকটি জড় ও চেতনের প্রাণস্বরূপ, তিনি কখনও শুধু গণ্ডীস্বার্থী সম্প্রদায়বিশেষের অথবা জীববিশেষের হ'তে পারেন না।

সেইজন্য একটি মানুষ আর্য্য হিন্দুমতের লোক হ'য়েও অনায়াসেই রসুলাল্লাকে (সঃ) অনুসরণ করতে পারে। আবার একজন আর্য্য মুসলমানেরও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুশাসন মেনে চলতে কোন বাধাই হয় না। যেমন ঈশ্বর, অবতারপুরুষ ও ধর্ম্ম সবারই জন্য, তেমনি খোদা, রসুল ও ইসলামও সবার জন্য। তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি নিয়ে যদি এই মৌলিক একত্বটাকে আমরা অনুধাবন করতে না পারি এবং মানুষের মস্তিষ্কে এই বোধের সঞ্চারণা ঘটিয়ে তাদের এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে

না পারি, তাহ'লে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার বিষস্রাবী গ্রন্থি থেকে মানুষকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারা যাবে না ।

প্রেরিতপুরুষগণ, ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ যাঁরা, তাঁরা কখনও একে অন্যের বিরোধী কথা বলেন না । দেশ-কাল পাত্র-আনুপাতিক, মানুষের প্রয়োজন ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁদের বাণীগুলি উচ্চারিত হয়েছে । আমরা যারা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন প্রবৃত্তি-অভিভূত মানুষ, তারা প্রেরিতগণ ও তাঁদের বাণীগুলির পটভূমিকা যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে অরঙ্গিল দৃষ্টি নিয়ে বিচার করি না । তাই তাঁদের মধ্যে দেখি বিভিন্নতা । একজনকে বড় ক'রে আর একজনকে ছোট করতে আমাদের বিবেকে এতটুকুও বাধে না । আমাদের মনগড়া প্রবৃত্তিমুখী ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের শাশ্বত সনাতন লোককল্যাণী বাণীরাজির বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে থাকি । যার যাতে সুবিধা হয়, সে সেইদিকে টেনে বাণীর ব্যাখ্যা করে । এইসব ক্ষেত্রে প্রেরিতপুরুষের অন্তরের ইচ্ছা তথা ঐশীভাবনা দলিত-মথিত হ'য়ে যায় । গ'ড়ে ওঠে বিভিন্ন সম্প্রদায় । একই প্রেরিতের অনুশাসনে যারা চলছে তাদের পরস্পরের মধ্যেও এইভাবে অনেক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'তে পারে ।

সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলি এমনই মূঢ় যে, তারা চিন্তাও করে না— তাদের ঐ বিভেদ-সৃষ্টিকারী আচরণের জন্য সাধারণ মানুষ জগতের আলো, প্রাণের প্রাণ ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমদের ভুল বুঝতে পারে । দেশে এখন সেই অবস্থাই এসেছে । কুপ্রবৃত্তি-মুখী একজন মুসলমানকে দেখে আমরা হয়তো চিরনমস্য হজরত মহম্মদকে (সঃ) বিচার করছি, একজন সঙ্কীর্ণস্বার্থী অহঙ্কারী ভণ্ড হিন্দুকে দেখে হয়তো কেউ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বিচার করছেন, আবার কেউ-বা মদমত্ত স্বেচ্ছাচারী একটি খৃষ্টানকে দেখে

বিচার করছেন ভগবান যীশুকে। এইভাবে ঈশ্বর অবহেলিত হচ্ছেন, ধর্ম্ম পদদলিত হ'চ্ছে, কল্যাণমুখী চিন্তাধারা প্রতিপদে ব্যাহত হ'চ্ছে। শ্রেয়পথকে অবজ্ঞা করলে, শ্রেয়পুরুষের সত্তাপালী পবিত্র নির্দ্দেশ বিকৃত ও অবমানিত হ'লে দুর্দ্দশা এসে ঝাপটে ধরবেই। আইন প্রণয়ন ক'রে বা উপদেশ মূলক বক্তৃতা দিয়ে দেশের এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানো যাবে না। পরিবর্ত্তন আনতে গেলে চাই অচ্যুতভাবে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের শরণ নেওয়া এবং তাঁর অনুশাসনে নিজেদের অনুশাসিত ক'রে তোলা।

যদিও 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ' তবুও বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলিকেই ধর্ম্ম ভেবে নিলে খুবই ভুল হ'য়ে যাবে। বাহ্য আচারকেই যারা ধর্ম্ম বলে চিহ্নিত করে, তারা দল বিভাগ ক'রে সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি ক'রে থাকে। একজন হিন্দুকে আমরা পূব বা উত্তরমুখী হ'য়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে দেখি, কিন্তু একজন মুসলমান পশ্চিমমুখী হ'য়ে উপাসনা করেন। বাইরের থেকে দেখে মনে হ'তে পারে—এইতো বিরোধ। কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, বিরোধ বলে যা' মনে হ'চ্ছে, আসলে তা' বিরোধই নয়।

পূর্ব্ব-শব্দের মানে সম্মুখভাগ, এগিয়ে যাওয়া। তাই পূর্ব্বমুখী হ'য়ে উপাসনা করার মধ্যে আছে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। উত্তর মানে উত্তরণ। সমস্ত বাধাবিপদকে উত্তরণ ক'রে অর্থাৎ পার হ'য়ে বর্দ্ধনার পথে চলাই হ'ল উত্তরমুখী হ'য়ে পূজার তাৎপর্য্য। আবার, হজরত মহম্মদের (সঃ) পুণ্য লীলাভূমি হ'ল মক্কা। মক্কা ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমে অবস্থিত। তাই, প্রতিটি ভারতীয় মুসলিম রসুলাল্লার (সঃ) দিকে মুখ ক'রে অর্থাৎ মক্কামুখী হ'য়ে উপাসনা করেন। পশ্চিমমুখী

হওয়াটাই লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য মক্কার দিকে মুখ ফেরানো। সেইজন্য মক্কার উত্তর ভূ-ভাগের বাসিন্দা যাঁরা সেই সব মুসলিম দক্ষিণদিকে মুখ ক'রে নামাজ করেন, মক্কার পশ্চিমে যাঁরা থাকেন তাঁরা পূবমুখো হ'য়ে নামাজ করেন, ইত্যাদি।

এইরকম আরো বহু অনুষ্ঠানের উল্লেখ ক'রে দেখানো যেতে পারে যে, আপাতদৃষ্টিতে যা' বিরুদ্ধ ব'লে মনে হয়, মূলে তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শুধু চাই মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে বের করা।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, মুসলমানরা এক-অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক, কিন্তু হিন্দুরা দেব-দেবী পূজা করেন। যাঁরা একথা বলেন তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে সাধনা, জ্ঞান ও দর্শন রাজ্যের চরম উপলব্ধি-গ্রন্থ উপনিষদের পাতায় পাতায় আছে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বহু ব'লে কিছু নেই)—জাতীয় কথা। আবার কাছে "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" অর্থাৎ সেই পরম সদ্‌বস্তু একই, বিপ্রগণ বহু ব'লে বলেন। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে থেকে তাদের চালিত করছেন। বহুত্ব-কল্পনার উদ্ভব হ'ল ঈশ্বরীয় গুণাবলীর বিশেষ-বিশেষ প্রয়োগ থেকে। যেমন, ঈশ্বরের সৃজনীশক্তি ব্রহ্মা নামে অভিহিত, পালনী-শক্তি বিষ্ণু এবং ধ্বংসাত্মক শক্তির নাম রুদ্র। তা' ছাড়া ঈশ্বরের মধ্যে আছে সর্ব্বগত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, প্রেম, কল্যাণ, রোগদলনী ক্ষমতা, ইত্যাদি। এক-এক সময় এক-এক ভাবের আরোপ করা হয়। সেই সেই ভাবের বোধ যেখানে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে, ঈশ্বরীয় গুণের যে-জ্যোতির বিচ্ছুরণ সেখানে ঘটে, সেখানে সেইরকম দেবতার আরোপ করা হয়। কারণ, দেবতা মানে দীপ্যমানতা। কোরান-শরিফেও আমরা আল্লাহ্‌তালার এরকম

বিভিন্ন গুণের সাক্ষাৎ পাই। তিনি "আল্-হক্" (সত্য), "আল্-খালিক্" (স্রষ্টা), "আল্-আখির" (অন্ত), "আল্-আজিজ্" (শক্তিমান), "আল্-ওয়াদুদ্" (প্রেমময়), ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূল তত্ত্বে অর্থাৎ তাহাত্বে কোন ফারাক নেই। ফারাক সৃষ্টি করেছে মানুষের দুষ্ট স্বার্থবুদ্ধি। উপায় ঈশ্বরের শরণ নেওয়া। আর, তা নিতে হ'লে ঈশ্বরকে জানেন যিনি, খোদার দোস্ত্ যিনি, মূর্ত্ত নরনারায়ণ যিনি, অকপটভাবে তাঁকে গ্রহণ ক'রে তাঁর অনুশাসনবাদ মেনে চলা দরকার। ধর্ম্মের গ্লানি হ'লে পৃথিবীতে ঐ জাতীয় বেত্তাপুরুষের আবির্ভাব হয়। জীবনের বিরোধী বার্ত্তাগুলিকে হটিয়ে দিয়ে তাঁরা সাত্বত পরিপোষণ দান করেন। তাঁদিগের অনুবর্ত্তন করলে কোন মানুষই তার বৈশিষ্ট্য হারায় না। প্রত্যেকের স্ব-স্ব বিশ্বাসক্ষেত্র আরো উর্ব্বর, আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। মানুষ উদার হয়। ভ্রান্তি ও ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ তাকে বিপর্য্যস্ত করতে পারে না।

প্রেরিতপুরুষ দুনিয়াতে বহু এসেছেন। এখন, এঁদের মধ্যে কাকে মানলে, কার অনুসরণ ক'রে চললে মানুষ ভ্রান্তিমুক্ত হ'তে পারে ? কে তিনি ? সবাই তো একই বার্ত্তাবাহী। তাহ'লে যে-কোন একজনের নির্দ্দেশমত চললেই হয়। এই একজন এমন হওয়া চাই, যিনি সমস্ত যথাযথভাবে পরিপূরণ করেছেন তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত গুরু-পুরুষোত্তমকে। যিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাউকে বড়, কাউকে ছোট করেন, তাঁর কাছে সত্যদৃষ্টি নেই। প্রেরিতদের মধ্যে যিনি বিভেদ সৃষ্টি করেন, তিনি কখনও মানুষকে নির্ভুল পথে চালাতে পারেন না, তাঁর দ্বারা সম্প্রদায় সৃষ্টি হবেই। কিন্তু সর্বশেষ আগত যে পুরুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত প্রেরিত পুরুষোত্তমের প্রতি

সশ্রদ্ধ ভক্তিপরায়ণ, কারো বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভেঙ্গে অন্য রূপ গ্রহণ করতে বলেন না, বরং তার নিজস্ব সাত্বত রকমটাকে উন্নত করার পথপ্রদর্শন করেন, যিনি ধর্ম্মের তথা ঈশ্বরের কখনও অন্তর সৃষ্টি করেন না, তিনিই শরণীয়, ভজনীয়, সেবনীয়। কারণ, সর্ব্বশেষ এমনতর যিনি, তাঁর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেই চেতনসন্দীপনায় জাগ্রত থাকেন। তাঁর ভিতরেই বিভিন্ন দেশে আগত ঈশ্বরাবতারগণের এক সার্থক সমঞ্জসা রূপ পাওয়া যায়। তাঁকে অস্খলিতভাবে হাতেকলমে অনুসরণ ক'রে চলার ভিতর দিয়েই ঐক্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্বতঃ ও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিলুপ্তি ঘটে। এঁদেরকে অবলম্বন ক'রেই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে অমৃতের পথ, শান্তির পথ, মহামিলনের পথ, মহা-জাগরণের পথ।

উপসংহারে উল্লেখ করি বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে আগত পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মহাবাণী—

"ভারত! যদি ভবিষ্যৎ-কল্যাণকে আবাহন করতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও—আর তোমার মূর্ত্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত (attached) হও,—আর তাদেরই স্বীকার কর—যারা তাঁকে ভালবাসে। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব।"

কোরান-দীপ্তি

আজ হ'তে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, আরবের মরুপ্রদেশে হজরত রসুল মোহাম্মদ মোস্তাফার (সঃ) কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল দিব্য আর্য্যগীতিকা। কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উচ্চারিত ঐরূপ গীতিকার নাম "গীতা" আর হজরত রসুলের (সঃ) মুখনিঃসৃত এই ঐশী বাণীরাজি "কোরান-শরিফ" নামে অভিহিত।

আমরা অনেকে কোরান পড়ি বটে, কিন্তু কোরানের ছত্রে ছত্রে যে আর্য্য ন্যায়-নীতি বা ধর্ম্মের শাশ্বত অনুশাসনগুলি বিধৃত আছে, সেগুলি লক্ষ্য ক'রে দেখি না। অথচ একটু অনুধাবন ক'রে দেখলেই দেখা যাবে যে, এশিয়া মহাদেশের একপ্রান্তে মরুভূমির মধ্যে উচ্চারিত হ'লেও কোরানের বাণীগুলি সেই এক চিরন্তন সত্যকেই প্রকাশ করছে। এই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবতার-মহাপুরুষ ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে যেসব কল্যাণকর বিধানের কথা বলেছেন, কোরানও এক বিচিত্র শৈলীতে, আরবী ভাষায় সেইসব বিধানগুলিই যুগোপযোগী রকমে বর্ণনা ও উপদেশ করেছেন।

জগতের ধর্ম্মাচার্য্যগণ চিরকালই জীবনকে সংরক্ষিত ক'রে উচ্ছল ক'রে তোলার কথা বলেছেন। আর, তার জন্য তাঁরা যে-পথ নির্দ্দেশ করেছেন, তা' হ'চ্ছে গুরু-পুরুষোত্তমের প্রতি একানুগত্য, এক কথায় অচ্যুত ইষ্টকেন্দ্রিকতা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬)—একমাত্র আমাকেই রক্ষা ক'রে চল। বাইবেলে যীশুখৃষ্টের কথা—"I am the way, the truth and the life." (St. John, 14/6) আমিই পথ, সত্য এবং জীবন। আবার কোরান-শরিফের অনুরূপ বাণী—"তোমরা আল্লাহ্ ও রসুলের অনুসরণ কর" (৩ঃ৩২)।

গুরু-পুরুষোত্তম যিনি, তিনিই ঈশ্বরের জীবন্ত বেদী, নররূপী বর্ত্তমান প্রেরিত। তাঁর সম্বন্ধে কোরান-শরিফে আছে—"তিনি (ঈশ্বর) স্বীয় অদৃশ্য বিষয় কাহাকেও প্রকাশ করেন না—তাঁহার মনোনীত রসুল ব্যতীত" (৭২।২৬-২৭)। এই মনোনীত রসুল বা প্রেরিতের নিকটেই ঈশ্বরের বার্ত্তা পাওয়া যায়। আরো আছে—"যে-কেহ রসুলের অনুগত হয়, নিশ্চয় সে আল্লারই অনুগত হইয়া থাকে (৪৮।১০)। কুলার্ণব-তন্ত্রে আছে "গুরুঃ সদাশিবঃ সাক্ষাৎ সত্যমেব ন সংশয়ঃ" (১৩।৬০)। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছেও ঐ একই বার্ত্তা আমরা শুনতে পাই। তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেছেন—

"প্রেরিত পুরুষোত্তম
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মহান গুরুদেরও আপূরয়মাণ,
পূর্ব্বতনদের শিরোভূষণ তিনি,
স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য তাঁর—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণত্ব,
তাই তিনি স্বতঃই লোক-উদ্গাতা—
নরবিগ্রহ,
তিনিই নরনারায়ণ,
ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত লোকপাবক—
প্রেরিত-পুরুষোত্তম।"

(আদর্শ-বিনায়ক)

প্রেরিত-পুরুষোত্তমগণ সকলেই একই ধর্ম্মের কথা, জীবনের কথা ব'লে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কখনও প্রভেদ হয় না। তাঁরা সেই

একেরই নব-নব কলেবর ।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—

"ঈশ্বর এক,

ধর্ম্ম এক—অভ্যুদয়ী ও নিঃশ্রেয়সী,

অবতার বা প্রেরিত মহাপুরুষগণ

একবার্ত্তাবাহী..... ।"

(আশিস্ বাণী)

কোরান-শরিফেও এই একই সঙ্গীত-ধ্বনি আমরা শুনতে পাই—

"আমরা তাঁহার রসুলগণের মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য করি না" (২।২৮৫) অথবা, "তুমি বল—আমি তো রসুলগণের মধ্যে অভিনব নহি" (৪৬।৯)।

ঈশ্বর এক, অখণ্ড—ঈশ্বরানুভূতির সার কথা এই-ই। উপনিষদ্ ব'লছেন—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে ।।"

(উহাও পূর্ণ; ইহাও পূর্ণ; পূর্ণ হ'তেই পূর্ণ উদ্‌গত হন। পূর্ণের থেকে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে)। কোরান-শরিফের উক্তি—

"তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্; সেই সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই"। (২।১৬৩)

আবার যুগ-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখেও উচ্চারিত হ'চ্ছে

একই কথা—

"ঈশ্বরকে দ্বয়ী ভাবতে যেও না·····'। (দর্শন-বিধায়না)

ঈশ্বর সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিজ্ঞানময়—এই চিন্তাটি পবিত্র কোরানে বড় সুন্দরভাবে বিবৃত আছে—

"তাঁহারই নিকট অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্চিকা আছে— তিনি ব্যতীত কেহই তাহা অবগত নহে ; এবং ভূতল ও সমুদ্র মধ্যে যাহা আছে, তিনিই তাহা পরিজ্ঞাত আছেন ; এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে ব্যতীত কোন পত্রও পতিত হয় না ।" (৬।৫৯)

ঠিক একই কল্পনা ভিন্ন ভাষায় রয়েছে—

"বিশ্বতশ্চক্ষুরেবায়মুতায়ং বিশ্বতোমুখঃ ।" ৭৮।

(শিবপুরাণ, বায়বীয়সংহিতা, পূর্ব্বভাগ, ৪র্থ অধ্যায়)

—পরমেশ্বরের চক্ষু ও মুখ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ।

ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ যখন দুনিয়ায় বর্ত্তমান থাকেন তখন ও অন্যান্য সময়েও সাধুর ভেকধারী ভণ্ডাচারী অনেক মানুষ দেখতে পাওয়া যায় । তারা মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে আত্মস্বার্থ সিদ্ধ ক'রে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তৎপর থাকে । গুরু-পুরুষোত্তমগণ এদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বলেছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—

"সাবধান থেকো
নকল প্রেরিতদের থেকে,
তা'রা তোমার কাছে
নম্র মেষের বেশেই আসবে হয়তো,
কিন্তু অন্তরে তা'রা
হিংস্র শার্দ্দূলের মত ।" (আদর্শ-বিনায়ক)

বাইবেলে আছে—

"Take heed that ye be not deceived : for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near : go ye not therefore after them." (St. Luke, 21/8)

(লক্ষ্য রেখো, তোমরা প্রতারিত না হও ; কারণ অনেকেই আমার নাম ক'রে এসে বলবে—আমি খৃষ্ট । সে সময় আসছে । তোমরা তাদের পিছনে যেও না) । কোরানে ঠিক একই বাণী—

"এই পার্থিব জীবনে যেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রতারক প্রতারণা করিতে না পারে ।" (৩১ ।৩৩)

ভক্তি-বিশ্বাস যদি প্রেরিতের মাধ্যমে ঈশ্বরে সুনিবদ্ধ হ'য়ে তাঁকেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে চলে, তাহ'লে তা' শক্তি ও ব্যাপকতায় মহীয়ান হ'য়ে পড়ে । এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—

"ভক্তি
মানুষকে কাপুরুষ ক'রে তোলে না,
বরং শিষ্ট পরাক্রমের সহিত
তা'কে কৃতিমান ক'রে তোলে—
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
শ্রেয়-পরিচর্য্যী উদ্দীপনায় ।"

(নিষ্ঠা-বিধায়না)

বাইবেলে উক্তি—

"That whosoever believeth in him (son of man) should

not perish, but have eternal life." (St. John, 3/15)

(তাঁকে যে বিশ্বাস করে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, বরং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।) শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন—

"(চাই) গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধ'রে-ধ'রে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সূতোর খি ধ'রে ধ'রে গেলে বস্তুলাভ হয়।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ১৯।২)।

কোরানেও বিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরানুগ্রহের কথা স্পষ্ট-ভাষায় বলা আছে—

"আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (৩।১৫২)।

আর অনুগ্রহ সে তেমনি পায় যে যাঁকে অনুসরণ-পূর্ব্বক যেমন গ্রহণ করে। তাই তাঁর নাম 'অনু-গ্রহ'।

ভারতীয় দর্শনে যেখানে অবতার-সম্বন্ধীয় কথা আছে সেখানে অংশাবতার ও পূর্ণাবতারের কথা অছে। কোরান-শরিফেও একই ধরণের উক্তি আছে—

"নিশ্চয় আমি নবীগণের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।" (১৭।৫৫)

সাধারণ প্রবৃত্তিমুখী মানুষ প্রেরিতপুরুষের পরমসত্তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের প্রবৃত্তিধর্ম্মের সাথে তাঁর সাত্বত নীতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এই কারণে তারা প্রেরিতদিগকে উপহাস ও অবজ্ঞা ক'রে থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।" (৯।১১)

(আমার পরম ভূতমহেশ্বর ভাব না জেনে মূঢ়গণ মনুষ্যদেহধারী ব'লে আমাকে অবজ্ঞা ক'রে থাকে ।)

বাইবেলের কথা—

"Verily, I say unto you, no prophet is accepted in his own country." (St. Luke, 4/24)

(আমি নিশ্চয় ক'রে তোমাদিগকে বলছি, কোন প্রেরিতই তাঁর নিজের দেশে গৃহীত হন না) । কোরানের পত্রেও সেই একই বার্ত্তা প্রচারিত—

"তাহাদের মধ্যে এমন কোনও রসুল আগমন করে নাই যে, তাহার সহিত উপহাস করা হয় নাই ।" (১৫।১১)

ধর্ম্মাচার পালনে কপটতার কোনও স্থান নেই । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—

"আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে, তোমার ধর্ম্মরাজ্যে ঢোকবার অধিকার জন্মেছে । .....যতদিন তোমার মন-মুখ এক না হ'চ্ছে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতই প'ড়বে না ।" (সত্যানুসরণ)

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" (১।৩।২৫)

অর্থাৎ ধর্ম্ম কপটতাহীন । কোরান-শরিফের পাতায়-পাতায় কাপট্যের নিন্দা রয়েছে । একটি উদাহরণ এইরকম—

"নিশ্চয় কপট-বিশ্বাসীরা নরকাগ্নির নিম্নতম স্তরে অবস্থিত এবং তুমি কখনই তাহাদের জন্য সাহায্যকারী পাইবে না ।" (৪।১৪৫)

কথা দিয়ে কথা না রাখা—অপরাধ। এতে অপরের কাছে বিশ্বাস তো হারাতেই হয়, তা'ছাড়া বারংবার ঐরকম কথাভাঙ্গার ভিতর দিয়ে নিজের মনোজগতেও এক সামঞ্জস্যহারা বিক্ষোভের সৃষ্টি করা হয়। এতে কর্ম্মও হ'তে থাকে খাপছাড়া। উন্নতির পথ চিররুদ্ধ হ'য়ে যায়। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর এবিষয়ে আমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছেন—

"কথায় আঁট নেই মানেই হ'চ্ছে
কথা ও কাজে মিল নহে,
সৎ ও সুধী ব্যাপারে
কথা দিয়ে না-করা মানেই হ'চ্ছে—
করবার শক্তিকে দুর্ব্বল ক'রে তোলা,
এমনতর করা ভাল নয়-কো;
বরং ব'লো—
আমি দেখি কী ক'রতে পারি;
আর সেটাও বেশ বিনিয়ে—
তোমার বোধ ও শক্তিমাফিক········।"

(সদ্-বিধায়না, ২য় খণ্ড)

কোরান-শরিফেও বলা আছে—

"কোন বিষয়েই বলিও না যে, নিশ্চয় আমি ইহা কল্য করিব।" (১৮।২৩)

প্রেরিত-পুরুষোত্তমগণ কোন মানুষকেই হারাতে চান না, আঘাত দিয়ে কাউকে পর ক'রে দিতে চান না। তাই কোরানের বাণী—

"তুমি লোকদিগের প্রতি বিমুখ হইও না এবং পৃথিবীতে হঠকারিতার সহিত বিচরণ করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ গর্ব্বিত আত্মাভিমানীদিগকে ভালবাসেন না।" (৩১।১৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন—

"কাউকে অবজ্ঞা বা অবহেলা তো
করবেই না,
খোঁচামারা আচার-ব্যবহারে
বিধ্বস্তও ক'রে তুলবে না...... ।"

(সদ্‌বিধায়না, ২য় খণ্ড)

আবার বলেছেন—

"ভুলেও নিজেকে প্রচার করতে যেও না বা নিজেকে প্রচার ক'রতে কাউকে অনুরোধ ক'র না—তাহ'লে সবাই তোমাকে ঘৃণা ক'রবে আর তোমা হতে দূরে স'রে যাবে ।"

অনুরূপ কথা বাইবেলেও র'য়েছে—

"Thou shalt love thy neighbour as thyself."

(St. Matthew, 22/29)

(তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজ সত্তার মতন ক'রেই ভালবাসবে ।)

অপরের প্রতি আমরা ভাল ব্যবহারই করি আর খারাপ ব্যবহারই করি বা যেমনই কর্ম্ম করি না কেন, প্রতিক্রিয়ায় ঠিক তেমনই সুভোগ বা দুর্ভোগ আমাদের ভোগ করতেই হয় । কর্ম্মফলের হাত থেকে কারো রেহাই নেই । শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর বলতেন—

"কর্ম্মফল আছেই আছে । লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে । পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে ।"

আর্য্যদর্শনের শাশ্বত কথাই এই। তাই কোরানেও আছে—

"আমি প্রত্যেক মানুষের স্কন্ধেই তাহার কৃত-কর্ম্মসমূহ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি।" (১৭।৩৩)।

আবার—"যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আল্লার পুরস্কার তাহাদের জন্যই শ্রেষ্ঠতর......।" (২৮।৮০)।

মহাপাপী যারা, যারা অন্যায়কারী, তারা যদি কুপথ ত্যাগ ক'রে আবার সৎপথে চলে, নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হয়, ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে ঈশ্বর-উপাসনা ক'রে চলে, তবে তাদের সে পাপাগ্নি ভস্মীভূত হয় ; আবার তারা সাধু ব'লে পরিগণিত হয়।

গীতার আশ্বাসবাণী—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ।।"

(৯।৩০)

(অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিন্ত হ'য়ে আমাকে ভজনা করে, তাহ'লে সে সাধু ব'লে গণ্য হয় ; কারণ সে সম্যক অধ্যবসায়সম্পন্ন)।

আবার কোরান-শরিফেও অসীম ভরসা দিয়ে এ কথা বলা হয়েছে—

"নিশ্চয়ই আমি তাহার জন্য ক্ষমাদানকারী—যে ক্ষমা-প্রার্থনা করে ও সৎকার্য্য করে, তৎপরে সুপথে চালিত হয়।" (২০।৮২)

স্বাধ্যায় ও উপাসনার কথা কোরানে বিশেষ জোর দিয়েই বলা আছে। যেমন—

"সূর্য্য অস্তপথে অবনমিত হইবার পর রজনীর অন্ধকার পর্য্যন্ত নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর এবং প্রভাতে কোরান পাঠ কর।" (১৭।৭৮)

অথবা, "প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। এবং রজনীর কিয়দংশ তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণিপাত কর এবং গভীর রাত্রে তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর।" (৭৬।২৫-২৬)

প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা এবং স্বাধ্যায়ের নির্দ্দেশ আমাদের স্মৃতিসংহিতাগুলিতে বিশেষভাবে আছে। নিষ্ঠাসহকারে সাধন-ভজন করার কথা কোরানে আরো অনেক জায়গাতেই আছে—

"হে মানব, নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনায় সাধনা কর—তবে তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিবে।" (৮৪।৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—

"উষানিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ,
যথাসময় ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।"

(অনুশ্রুতি, ১ম খণ্ড)

সাধন-তপস্যা অনেকেই করেন এবং ব্যক্তিগত জীবন গঠনে তা' করাও দরকার। কিন্তু এই পথে যাঁরা আরো এগোতে চান, তাঁদের প্রতি গভীর রাতে ব্যক্তিগত সাধনার নির্দ্দেশও কোরানে আছে। যেমন—

"নিশ্চয়ই রাত্রে গাত্রোত্থান করা একান্ত আত্মসংযম ও বাক্য-সংশোধনকারী। নিশ্চয় দিবসে তোমার জন্য বৃহত্তম বিষয়কর্ম্ম রহিয়াছে।" (৭৩।৬-৭)

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ কথা পাওয়া যায়—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ।।"

(২।৬৯)

(সকল প্রাণীর পক্ষে যেটা নিশাকাল, সংযমী পুরুষ সেখানে জেগে থাকেন ; আর যে-সময় প্রাণিগণ জাগ্রত থাকে, দর্শনবান মুনির পক্ষে সেটা হয় নিশাকাল) । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ভজনের কাল নির্দ্দেশ করেছেন গভীর রাত্রে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নিত্য ইষ্টভৃতি পালনের কথা বলেছেন । বলেছেন—দৈনন্দিন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ভক্তিসহকারে ইষ্টভৃতি ইষ্টেরই জন্য নিবেদন করতে হবে । কোরান-শরিফে এই কথাটি প্রায় একই ভাবে আছে—

"নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর ।...... তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম কার্য্য হইতে যাহা অগ্রে প্রদান করিবে আল্লার নিকটে তাহাই প্রাপ্ত হইবে—উহা কল্যাণকর বৃহত্তর প্রতিদান ।" (৭৩।২০)

বাণীর মধ্যে 'জাকাত'-শব্দটির মানে হ'ল ধর্ম্মার্থে দান । বর্ত্তমানের ইষ্টভৃতিরই তৎকালীন রূপ ওটি বলা যায় ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গীতা ও কোরানের সিদ্ধান্ত একই রকম । গীতা বলছেন—তিনি

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ।" (৪।৬)

অর্থাৎ জন্মবিরহিত এবং পরিণাম বা ক্ষয়বিহীন। আর কোরানের কথা হ'ল—

"তিনি জন্মদান করেন না এবং জন্মগ্রহণ করেন নাই! এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।" (১১২।২৪)

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের পৌরাণিক ধারণা হ'ল—প্রথমে জল সৃষ্টি হ'ল। তারপর তা' থেকে অন্যান্য সৃষ্টি। মনুসংহিতায় যেমন আছে—

"অপ এব সসর্জ্জাদৌ।" (১।৮)

অর্থাৎ আদিতে ঈশ্বর জল সৃষ্টি করলেন। কোরানেও আছে—

"প্রত্যেক চেতন পদার্থকে সলিল হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।" (২১।৩০)

আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে 'ভূর্ভুবঃস্বঃ'—আদি সপ্ত আকাশ বা সপ্ত লোকের কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। কোরানেও সপ্ত আকাশের কথা বিশেষভাবে বার বার আছে। যেমন—

"তিনি দুই দিবসের মধ্যে সপ্ত আকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।" (৪১।১২)

আর একটি—"তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আল্লাহ্ কিরূপে স্তরে-স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।" (৭১।১৫)

বর্ত্তমান যুগে স্বার্থান্ধ প্ররোচনার বশে আমরা অনেক অন্যায় করি, আত্মম্ভরি উন্মাদনায় অপরের মতকে অগ্রাহ্য করি, সহ্য করতে পারি না।

কিন্তু কোরানের নীতি তা' নয়। কোরান সবাইকে সহ্য করতে বলে, বিরোধ করতে নিষেধ করে। সেখানে আমরা পাই—

"তোমরা ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতবিরোধ করিও না। (৪২।১৩)

এটা ধর্ম্মনীতির শাশ্বত নির্দ্দেশ। কোরানে প্রচারিত ইসলাম অর্থাৎ শান্তির ধর্ম্ম সবার মধ্যেই শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে, এক আদর্শ নিয়ে যাঁরা চলেন, সতীর্থ যাঁরা, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা—কোরানের প্রথম উপদেশ। যেখানে আমরা পাই—

"যদি বিশ্বাসিগণের মধ্যে দুইদল সংগ্রাম করে, তবে তদুভয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়া দাও।...... বিশ্বাসিগণ ভ্রাতা ব্যতীত নহে ; অতএব তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।" (৪৯।৯-১০)

প্রেরিতপুরুষগণ এই একই ধর্ম্মনীতি যুগে-যুগে ব'লে এসেছেন এবং ব'লে থাকেন। কোরানে আছে—

"নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে রসুলগণের জন্য যাহা বলা হইয়াছিল তদ্ব্যতীত তোমাকে বলা হয় নাই।" (৪১।৪৩)

একই কথা গীতায় কী সুন্দরভাবে আছে দেখা যাক—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্ বাকবেহব্রবীৎ।।
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।"

(৪।১-২)

(এই অক্ষয় যোগের কথা আমি বিবস্বানকে বলেছিলাম ; বিবস্বান

মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিরা জানতেন।)

প্রেরিতপুরুষগণের একমাত্র চেষ্টা থাকে মানুষকে ঈশ্বরমুখী ক'রে তোলার জন্য। কারণমুখী ভাব নষ্ট হ'য়ে শুধু কর্ত্তব্যপালন ক'রে গেলে কেউ কখনও সাত্বত উন্নতির অধিকারী হ'তে পারে না। মানুষ সংসার করুক, চাকরী করুক, রাজ্যশাসন করুক বা যুদ্ধবিগ্রহ করুক, সবটাই হওয়া চাই ইষ্টার্থে তথা ঈশ্বরার্থে। তা' না হলে কোন করাই কল্যাণকে আবাহন করে না। তাই, কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের ফল তাঁতে ন্যস্ত করে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মার্থে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। আর ফলস্বরূপ বলেছিলেন, যুদ্ধে নিহত হ'লে স্বর্গলাভ করবে এবং জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে (২।৩৭)। অনুরূপ কথা কোরানেও আছে। সেখানে বলা হয়েছে—

"যাহারা আল্লার পথে দেশত্যাগ করিয়াছে, তৎপরে নিহত অথবা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম জীবিকা প্রদান করিবেন।" (২২।৫)

হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ক্ষতিকারক কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত হ'য়ে সংযমী চলনে চলা, সবার প্রতিই দরদ-ভালবাসা রক্ষা ক'রে চলা—এগুলি কোরানের শাশ্বত উপদেশবাণী। আমরা পালন করি বা না-করি, সেকথা আলাদা। কিন্তু প্রেরিতপুরুষগণ এ-কথা চিরযুগেই ব'লে গেছেন। কোরানের এক জায়গায় আছে—

"(যে) স্বীয় আত্মাকে দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, তবে নিশ্চয় স্বর্গোদ্যানই তাহার বাসস্থান।" (৭৯।৪১)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সমতুল উক্তি—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।।"

(১২।১৫)

(যিনি কাউকে উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কারো দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়)। সেইজন্য আবার দেখতে পাই, কোরানে জীবহত্যাকে প্রশংসা করা হয়নি। বরং প্রকারান্তরে নিষেধ করা হয়েছে এবং সংযত জীবন যাপনকেই আদর্শ ব'লে বলা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ 'সুরাহজ্'-এর একটি আয়াত দেখা যাক—

"উহাদের (জীবের) মাংস অথবা উহাদের রক্ত কখনই আল্লার নিকট উপনীত হয় না, বরং তোমাদের সংযমই তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া থাকে।" (২২।৩৭) লোভী মনোভাবটাকে বিশেষ ক'রে নিন্দা ক'রে কোরান বলেছেন—

"আধিক্যের আকাঙ্ক্ষাই তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।" (১০২।১)

আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে, কোরানের মধ্যে বর্ণাশ্রমের ইঙ্গিত এবং আর্য্যবিবাহনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। যেমন এক জায়গায় পাওয়া যায় বর্ণাশ্রমের ইঙ্গিত—

"আমি তোমাদিগকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বংশ করিয়াছি— যেন তোমরা পরস্পরকে পরিজ্ঞাত হও।" (৪৯।১৩)

আবার আছে—'আল্লাহ্ উপজীবিকা সম্বন্ধে তোমাদের কাহাকেও

কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।' (১৬।৭১)

সৃষ্টির মধ্যেই যে বিভিন্নতা অনুস্যূত রয়েছে, তাই-ই শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন বর্ণ তারই প্রকাশ-ফল। এখানে সেই কথাই সূচিত হয়েছে।

বিবাহ সম্বন্ধেও এমন বহু কথা পাওয়া যায়। সংহিতার বিধান, পিতৃকূলের ৭ পুরুষ ও মাতৃকূলের ৫ পুরুষ বাদ দিয়ে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়। বিশেষতঃ পিতা যে-বংশে বিবাহ করেছেন, সন্তানের সে বংশে বিবাহ অনুচিত। কোরান-শরিফ বলছেন—

"তোমাদের পিতৃগণ নারীকুলের মধ্যে যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না।" (৪।২২)

ধর্ম্মবিবাহ অচ্ছেদ্য। বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি খুব সহজভাবে কোরানে নেই। কয়েকটি অনিবার্য্য ক্ষেত্রে নানাভাবে ঘুরিয়ে বিচ্ছেদের সমর্থন করা হয়েছে বটে। সঙ্গে-সঙ্গে আয়াতের শেষে বলা আছে— "মীমাংসাই কল্যাণকর" (৪।১২৮)অথবা "যদি তোমরা সম্মিলিত ও সংযমী হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়" (৪।১২৯)। যে-কোনভাবে হোক, বিচ্ছেদ যদি না হয় তবেই ঈশ্বর খুশী হন। আমরা ইসলামের তালাক দেবার কথাটাই শুধু জানি, কিন্তু তা' যে একেবারে শেষ পর্য্যায়ে এবং অনিচ্ছা-সত্ত্বে-দেওয়া সে খবর কয়জনে রাখি।

ব্যভিচারকে কোরান-শরিফে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যভিচারের ভিতর-দিয়ে জাত, জনম ও পবিত্রতা ছিন্নভিন্ন হ'য়ে ধুলিসাৎ হয়। তাই, ঈশ্বরের বিধানে ব্যভিচারের স্থান নেই।

"নিশ্চয় আল্লাহ্ অশ্লীলতার আদেশ করেন না।" (৭।২৮)

আবার—"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তী হইও না; নিশ্চয় উহা অশ্লীলতা ও কুপথ।" (১৭।৩২)

ধর্ম্মের শাশ্বত নীতিগুলির মধ্যে এটিও একটি। ধর্ম্ম তাই যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে। এছাড়া আর যা'কিছু তা' ধর্ম্মের সত্যরূপ নয়।

এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে প্রচুর উদাহরণ টেনে দেখানো যেতে পারে যে, ধর্ম্মের মূল নীতি চিরকালই এক ও অভিন্ন। সুদূর পশ্চিম এশিয়ার মরু-অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েও হজরত রসুল (সঃ) আর্য্যধর্ম্মই প্রচার করেছেন। যুগের আবহাওয়া, মানুষের প্রয়োজন ও গ্রহণক্ষমতা-আনুপাতিক কেবলমাত্র প্রেরিতপুরুষদের বলার ধরণটা আলাদা হ'য়ে থাকে। হজরতেরও (সঃ) তাই হয়েছিল। খুঁজে দেখলে কোরানের সর্ব্বত্র এর প্রমাণ মিলবে। আমরা ভিতরে প্রবেশ ক'রে বস্তু বা বিষয়গুলি স্বরূপতঃ দেখি না বা দেখার চেষ্টাও করি না। বাইরের খাপখানার চাকচিক্য দেখেই ভিতরের বস্তুর বিচার করতে যাই। ফলে আসল জিনিসটা আর ধরতে পারি না, মতান্তর ও মনান্তর প্রবল হ'য়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি থাকলে মূল কারণটিকে জানা যায় এবং অনর্থক বিরোধেরও অবকাশ থাকে না।

উপসংহারে এই কথা বলতে ইচ্ছা করে, কোরানের উপরিলিখিত আয়াতগুলির সাথে আর্য্য-অনুশাসনের সাদৃশ্য বিচার ক'রে সমগ্র কোরান-শরিফকে যদি 'কোরান-সংহিতা' নামে অভিহিত করা যায়, তাহলে সেটা কি খুব ভুল হবে?

দয়ালগুরু ও ইসলাম

(১)

প্রেরিতপুরুষগণের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাঁরা কখনও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণের নিন্দা করেন না। একজনকে ছোট ক'রে অপরকে বড় করতে চান না। বরং তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক প্রেরিতকে পরিপূরণ করেন তাঁদের জীবন ও বাণীর দ্বারা। তাঁদের কথার মধ্যে এই সুরটা থাকেই—'পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব'। পরবর্ত্তী প্রেরিত পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকেন। পরবর্ত্তীর কথার মধ্যে এমন ভাব থাকে, তিনি যেন পূর্ব পূর্ব প্রেরিতগণের পরম ভক্ত। তাঁর অনুগামীদিগকেও তিনি পূর্ববর্ত্তীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ক'রে তোলেন। এ তাঁর স্বভাবলক্ষণ। প্রেরিতপুরুষের মধ্যে এই লক্ষণ এতই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত যে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে—এই গুণ যাঁর মধ্যে নেই, তিনি প্রেরিতপুরুষ নন বা কপটপ্রেরিত।

বর্তমান যুগের সর্ব্বশেষ প্রেরিতপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মধ্যেও এই লক্ষণ সহজভাবে প্রকট ছিল। তাঁকে আশ্রয় ক'রে আমরা পূর্ববর্ত্তী প্রেরিতগণকে আরো ভালবাসতে, আরো বাস্তবভাবে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। বিভিন্ন প্রেরিতের বিভিন্ন কথাকে অবলম্বন ক'রে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও জীবনের মধ্যে আমরা পেয়েছি তার সমাধানী সুর। তাঁর কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রকারের বিচ্ছিন্নতার রশ্মি একসূত্র সঙ্গত হ'য়ে উঠেছে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রেরিতগণের কথার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। সম্প্রদায়গত যে বিভেদ আমরা আমাদের চারপাশে দেখি, তার উৎস অজ্ঞতা। অজ্ঞতাবশেই একে অপরের নিন্দা করে, একজন আর একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে তৎপর হ'য়ে ওঠে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রেরিতদের বাণীগুলি যেমন যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তেমনি তাঁদের জীবনকথাও নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কারণ, কারো লেখা বা কথা ঠিকমত জানতে গেলে তার

জীবন ও জীবনদর্শন যথাযথভাবে জানা দরকার। প্রেরিতপুরুষের বেলায় একথা তো আরো বেশী ক'রে সত্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যখন যে প্রেরিতের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, মনে হত, তিনি ঐ প্রেরিতপুরুষের একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে এই গুণ এত দৃঢ় ও স্বাভাবিক দেখা গেছে যে, সেই প্রেরিতের অনুসরণকারিবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের ইষ্টকে। বিগত ইষ্টপুরুষের মূর্ত্ত প্রতিরূপ ব'লে বোধ করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে, তাঁকে গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথা যখন বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, তখন মনে হয়েছে তিনি আদর্শ কৃষ্ণভক্ত। ভগবান যীশুর কথা বলার সময় তাঁকে মনে হ'ত প্রকৃত খ্রীষ্টানুগামী। হজরত মহম্মদের (সঃ) প্রসঙ্গ উঠলে প্রতীয়মান হ'ত তিনি যথার্থ ইসলামপন্থী। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উল্লেখ করার সময় লোকে তাঁকে প্রকৃত বৈষ্ণব ব'লে মনে করেছে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে বলার সময় তাঁকে দেখা গেছে, তিনিই যেন পরমহংসদেবের যথাযোগ্য উত্তরসূরী। তিনি ছিলেন আধুনিকতম শেষ প্রেরিত। তাঁরই মধ্যে পূর্ববর্ত্তী সবাইকে পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত দেখা গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্ত মহাজীবনের এই একটা দিকেরও সবটুকু নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থ হ'য়ে যাবে। তিনি রসুলাল্লা হজরত মহম্মদ (সঃ) তথা ইসলামকে কিভাবে পরিপূরণ করেছিলেন, বর্তমান নিবন্ধে সেই প্রসঙ্গেই সামান্য কিছু আলোচনা করা হবে।

একদিন বিকালে আমরা অনেকে ব'সে আছি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। নানা বিষয়ে কথোপকথন হ'চ্ছে। কথায় কথায় ডাইভোর্স-এর কথা উঠল। ডাইভোর্স যে ভাল নয়, এ নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। বললেন—"পুরুষোত্তমরা ডাইভোর্স সমর্থন করেননি। শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, হজরত রসুল (সঃ) কারো কথায় এর সমর্থন পাওয়া যাবে না।"

প্রশ্ন করা হ'ল,—মুসলমানরা যে তালাক দিয়ে থাকেন ? শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"কোরানে তা' কেমনভাবে আছে দেখলে হয়। নিয়ে আয় কোরান। আমি দেখাচ্ছি।" বঙ্গানুবাদ-যুক্ত একখানা কোরান-শরিফ তাঁর হাতে এনে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ার উপরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। বালিশ সরিয়ে দিয়ে উঠে আসন ক'রে বসে দুই হাতে কোরানখানা নিলেন। ঐভাবে ধরে আগে মাথায় ঠেকালেন। তারপর হাতের উপর রেখেই পাতা ওলটাতে লাগলেন। ৪র্থ সুরার ৬ষ্ঠ রুকু থেকে বের ক'রে নিজেই প'ড়ে শোনালেন—'যদি তাহারা মীমাংসা আকাঙ্ক্ষা করে তবে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করিবেন"। পরে বললেন—"এই দেখ্, সামাজিক গোলযোগে যদি কেউ ডাইভোর্স ক'রেই বসে, তবুও পরস্পর মিলিত হওয়াটাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।" তারপর তিনি কোরান বন্ধ ক'রে ভক্তিভরে সাবধানে রেখে আসতে বললেন। আবার পূর্ব্ববৎ আলোচনা চলতে লাগল।

ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে শিখলাম, ধর্ম্মপুস্তক, বিশেষ করে প্রেরিত-পুরুষোত্তমের বাণীগ্রন্থ্ কিভাবে হাতে নিতে হয়, কতখানি শ্রদ্ধা দেখাতে হয়। আর, ঐ গ্রন্থকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন মানে সেই গ্রন্থের স্রষ্টা প্রেরিত পুরুষোত্তমকেই শ্রদ্ধা জানানো। আরো উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় কোন মুসলমান ভাই কাছে উপস্থিত ছিলেন না যে তাকে দেখাবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর পবিত্র কোরানকে ঐভাবে শ্রদ্ধা জানালেন। তাঁর মধ্যে সহজভাবে যা অবস্থিত, তাই-ই বাইরে উৎসারিত হ'য়ে এসেছে। অবাক হ'য়ে ভাবছিলাম, আমি হিন্দু বামুনের ছেলে হ'য়েও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে কোনদিন এমনভাবে পূজা করতে শিখিনি, কাউকে করতেও দেখিনি। এই হ'লেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

পরে যখন তিনি কোরান-সম্পর্কে গবেষণা করতে আদেশ করলেন, তখন যে-বিষয়টার উপরে তিনি বিশেষ জোর দিতে বলেছিলেন, তা' হচ্ছে

নিরামিষ আহার। বার-বার, এমন কি দিনে কখনও কখনও ৪০।৫০ বার করেও জিজ্ঞাসা করতেন, কোরানে নিরামিষ আহারের সমর্থন আছে কিনা। আমরা খুঁজে চলেছি আয়াতের পর আয়াত, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। কিন্তু কোথাও এমনতর নির্দেশ বা ঈঙ্গিত পাচ্ছি না। বরং পশুমাংস আহারের কথা আছে। তবে পশুমাংস আহার করতে গেলেই যে তা' ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া চাই, এ কথাটা বার বার পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসব বলি। কিন্তু তিনি তৃপ্ত হতে পারেন না। বলেন, "খোদার দোস্ত যিনি তিনি কখনও জীবহত্যা ক'রে তার মাংস ভক্ষণের নির্দেশ দেবেন, এ আমার মনে হয় না। তুমি যদি খোদার সৃষ্টি হও, তবে ঐ জীবটা খোদার নয়? একটা প্রাণ নষ্ট করলে তাঁর কষ্ট হয় না? আরো ভাল করে খুঁজে দেখ্।"

তাঁর আদেশে চলতে লাগল অনুসন্ধান নানাভাবে। এক একটি কথা বা আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে তখন তাঁর কাছে দীর্ঘ সময় ধ'রে আলোচনা চলত। কখনও কখনও দিন শেষ হ'য়ে রাত্রি গভীর হ'য়ে এসেছে। তবুও আলোচনা শেষ হয়নি। পরদিন আবার ভোর থেকেই শুরু হয়েছে।

এইভাবে চলতে চলতে যেদিন পাওয়া গেল কোরান শরিফের নির্দ্দেশ—"পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে ভক্ষণ কর", সেদিন উল্লসিত হ'য়ে উঠে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—"এইতো কাছাকাছি হয়েছে। আরো ভালো ক'রে দেখ্।"

তারপর একদিন পেলাম—"যে কাহারও জীবনরক্ষা করে, তবে সে যেন সমস্ত লোকের জীবনরক্ষা করিল" (কোরান—৫ঃ৩২)। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলতেই তিনি আনন্দে ভরপুর হ'য়ে বললেন—

"তাহ'লে দেখ্, ঈশ্বরের নির্দ্দেশ জীবনরক্ষা, জীবননাশ নয়। এইরকম হ'লে ঠিক হয়। আরো খোঁজ্।"

খোঁজা চলল। তারপর কোরান-শরিফের ২২ সুরার ৩৭ আয়াতে এসে পাওয়া গেল—"উহাদের মাংস অথবা উহাদের রক্ত কখনই আল্লার নিকট উপনীত হয় না ; বরং তোমাদের সংযমই তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া থাকে।" শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকদিনই এই কথাটি বলতেন। জায়গা মতন বের ক'রে দেখাতেই তাঁর চোখ-মুখ এক অপূর্ব আনন্দের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। বললেন—'এইতো কথা। এইবার পথ পাবি। এর সমর্থনে আরো কী কী পাওয়া যায় দেখা লাগে।"

সত্যিই পথ খুলতে লাগল। মনে হ'ল, জীবের রক্তমাংস যদি ঈশ্বরের কাছে নাই পৌঁছায়, তবে তা' ঈশ্বরের নামে নিবেদনই-বা করা যায় কি করে ! যা' ঈশ্বরকে নিবেদন করা যেতে পারে, তাই-ই তো ভোজনযোগ্য। তাহলে খাদ্য হিসাবে প্রাণিমাংস আপনা হ'তেই বর্জ্জন হ'য়ে যায়।

বেশ, তা'হলে খাদ্য হিসাবে কোরানের পবিত্র নির্দেশ কী? সেটা পাওয়া গেল আরো পরে। কোরান-শরিফের ৮০ সুরায় ২৪-৩২ আয়াতে আছে—"মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক। নিশ্চয় আমি সুবর্ষণে বারিবর্ষণ করিয়াছি। তৎপর আমি ভূতলকে সুবিদারণে বিদীর্ণ করিয়াছি, পরে তন্মধ্যে শস্য উৎপাদন করিয়াছি। এবং আঙ্গুর ও শাকসব্জী ; এবং জৈতুন ও খর্জ্জুর ; এবং নিবিড় উদ্যান-সমূহ ; এবং ফল ও তৃণ ; উহা তোমাদের জন্য ও তোমাদের পশুসমূহের জন্য উপকারী।" জৈতুন হ'ল জলপাই-জাতীয় ফল। এখানে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর মানুষের জন্য যে খাদ্য অনুমোদন করলেন তা' ফল ও শাক-শব্জী। কোথাও মাছ-মাংসের কথা নেই। খাদ্যের উল্লেখ ক'রে কোরানের স্পষ্ট নির্দেশ এই-ই। আমরা আমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা নানারকম করতে পারি। কিন্তু যিনি কোরানের বাণীর জীবন্ত মূর্ত্তি, একমাত্র তাঁর কাছেই পাওয়া যেতে পারে এর যথার্থ ব্যাখ্যা। তিনি ছাড়া অন্যত্র যে-কোন জায়গার ব্যাখ্যাতেই

কিছু প্রবৃত্তির আবিলতা থাকতেই পারে। আর প্রবৃত্তিরঙ্গিল চিত্তে সত্যালোক যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ছিলেন মূর্ত্ত কোরান, জীবন্ত বাইবেল, সচল প্রাণবন্ত গীতা। দেশকাল-পাত্রের যতটুকু বিভিন্নতা, তা' ছাড়া তাঁর মধ্যে প্রেরিতদের বাণীরাজির সার্থক রূপায়ণ আমরা দেখেছি। তাইতো তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছে নির্ভুল পথনির্দেশ, পবিত্র বাণীসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা। জগতে এমন মানুষের দেখা কদাচিৎ পাওয়া যায়। আর, যখন তিনি আসেন তখন সকল সমাধানী বার্ত্তা তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, সমস্ত বিরোধের অবসান হয়, মানুষের ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ সুগম হ'য়ে ওঠে।

খাদ্য সম্বন্ধে কোরান-শরিফের ঐ নির্দ্দেশ যখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনানো হ'ল, তখন তিনি বললেন—

"সব ঈশ্বরাবতারেরই এই কথা। ঈশ্বরের যা' অভিপ্রেত নয়, তা' তাঁরা বলতে পারেন না।"

রসুলাল্লা হজরত মহম্মদ (সঃ) যে সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তৎকালে এক ধরণের মানুষ ছিল, যাদের পক্ষে মাংসাহার ত্যাগ করা সহজ ছিল না। তাদের জন্য ঈশ্বরে নিবেদন ক'রে খাওয়ার কথা বললেও কোন্ খাদ্য গ্রহণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত তা' স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু প্রেরিতপুরুষগণ অনেকেই আমিষাহার করেছেন, একথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তুলে ধরাতে তিনি বলেছেন—"প্রথমে তাঁরা খেয়েছেন। খেয়ে দেখেছেন এর ফলে শরীরে কী বিপর্য্যয়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, একটা জীবকে হত্যা করার সময় তার শরীরে কী ভীষণ বেদনা লাগে তা' তাঁরা অন্তর দিয়ে বোধ করেছেন। পরম দয়াল তাঁরা। তাই বিশ্বমমত্ব-বোধেই তাঁরা এর নিষেধ করেছেন। খুঁজে দেখ্, আমি শুনেছি, হজরত রসুল (সঃ) মধু, খেজুর, যবের রুটি এই সব খেতেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের এ কথার সমর্থন হাদিসের মধ্যেই পাওয়া গেল। হাদিসের মধ্যে অবশ্য সব হাদিস্ প্রামাণ্য নয়। কোরানের কথার সাথে যার সঙ্গতি আছে, সেই হাদিসই প্রামাণ্য ও গ্রহণীয়, অন্যগুলি বর্জনীয়। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিষয়ে সচেতন থেকে হাদিস অন্বেষণ করতে বলতেন। আমরা তাই করেছি।

হাদিসে একটি গল্প আছে। একটি বারবনিতা একদিন দ্বিপ্রহরে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটি কূপের পাশে দেখে, একটি কুকুর জিভ বার ক'রে হাঁফাচ্ছে এবং সতৃষ্ণ নয়নে বার বার কূপের দিকে তাকাচ্ছে। রমণী বুঝতে পারে, কুকুরটি পিপাসার্ত্ত। হাতের কাছে কোন জলপাত্র নেই। তখন সে তার জুতা খুলল। চুলের খোঁপা খুলে সেই চুলবাঁধা দড়ি গিঁট দিয়ে জুড়ে লম্বা ক'রে জুতায় বেঁধে জুতায় ক'রে জল তুলে কুকুরটিকে খাওয়াল। কুকুরটি তৃপ্ত হ'য়ে চ'লে গেল। রসুলাল্লার (সঃ) কাছে যখন এ গল্প বলা হয় তখন তিনি বলেন—"বেশ্যাবৃত্তিতে ঐ রমণীর যত গুণাহ্ (পাপ) হয়েছিল, জীবের প্রতি এই করুণা প্রদর্শনে আল্লাহ্ তার সব দোষ ক্ষমা করবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুর একথা শুনে সোল্লাসে বললেন—"ঐ দেখ্, জীবের প্রতি অতটুকু দয়া করতেই যিনি একটা লোকের সারাজীবনের পাপের ক্ষমা হ'ল বলতে পারেন, তিনি কি কখনও জীবের প্রতি নৃশংস হ'তে আদেশ দেন ? রসুলাল্লা (সঃ) কত বড় দয়াল ছিলেন, তা' এর থেকেই বুঝতে পার।" এরকম কাহিনী হাদিসে আরো আছে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—শ্রীশ্রীঠাকুর এভাবে জীবহিংসা মোটে কোথাও ছিল না তা প্রমাণ করতে চাইছেন কেন ? চাইছেন একটি বিশেষ কারণে। প্রাণিমাংস ভক্ষণ করতে গেলেই তাকে হত্যা করতে হয়। আর, হিংসার ভাব ছাড়া হত্যা করা যায় না। এখন, ভোজনের উদ্দেশ্যেই হোক আর যে কোন ভাবেই হোক, হিংসার ভাব যদি একবার ভিতরে বাসা বাঁধে তাহলে তা' শুধু ভোজনার্থে জীবহত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ

না থাকতে পারে। হিংসাকে ভেতরে প্রশ্রয় দিয়ে পুষ্ট হ'তে দিলে তার যথাযোগ্য কর্তব্য সে করবেই। নানাভাবে সে মানুষের ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ফুটে বেরুতে চাইবে। এমন-কি, অপর মানুষের প্রতিও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। কখনও কারো কথায় বা ব্যবহারে নিজের অহং আহত হলেই মানুষ হিংসার মধ্য দিয়েই তার প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করবে। এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে হিংসার বিষ। যার রূপ আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মারামারির মধ্যে।

প্রেমিক মহামানব, অবতারপুরুষ যাঁরা, যাঁরা জনকল্যাণার্থে আবির্ভূত হন, তাঁরা এসব দেখে কষ্ট পান। অকারণ হিংসাত্মক দলাদলিকে তাঁরা পৃথিবী থেকে নির্ম্মূল ক'রে দিতে চান। তার জন্য নিজেদের জীবন দিয়েও তাঁরা অশেষ কষ্ট সহ্য করেন। আমরা জানি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যাতে বন্ধ হয়, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অধিপতি হয়েও স্বয়ং দূতবেশে কৌরব-রাজসভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ মূঢ় অহঙ্কারবশে, ঔদ্ধত্যে যখন এই সব প্রেমের ভিখারীদের প্রত্যাখ্যান করে, তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার যথাযোগ্য সন্মান না দেয়, তখন তারা কালগ্রস্ত হয়েই ধ্বংস হয়। তখন ঐ প্রেমিক পুরুষের মুখেই আবার শোনা যায় মহাভাব-বাণী—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ" (গীতা, ১১।৩২) অর্থাৎ আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর কাল, লোকসংহার করার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছি।

মানুষ যাতে এইভাবে কালের কবলে প'ড়ে বিধ্বস্ত না হয় তার জন্য প্রেতিপুরুষগণ চেষ্টা করেন। তাঁদের কথা ও কাজ সেইমতই হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বাস করেন, কোরানেও কখনও ঐরকম অকারণ হিংসার কথা থাকতে পারে না। হজরত রসুলের (সঃ) মত মানুষ কখনও হিংসার বীজকে ভেতরে পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত করার কথা বলতে পারেন না। আর, তাঁরই আশীর্ব্বাদে কোরান এবং অন্যান্য ইসলাম-গ্রন্থ থেকে

এর প্রভূত সমর্থন একে একে পাওয়া গেল। হজরত রসুলের (সঃ) জীবন ভালভাবে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, কী অনিবার্য্য অবস্থায় তিনি তাঁর জীবনের যুদ্ধগুলি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে অহংমত্ত মূর্খ মানুষগুলি তাঁর উপরে কী ভীষণ অত্যাচার করেছিল। হজরত মহম্মদ (সঃ) বারংবার ক্ষমা ক'রে চলেছিলেন। তাঁর অপরাধ, তিনি বিচ্ছেদধর্ম্মী ঈশ্বরমুখী মানুষগুলিকে একসূত্রান্বিত ক'রে ঈশ্বরবিমুখ তথা শক্তিশালী ক'রে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ তাঁকে বোঝেনি। নানাভাবে তাঁকে নির্য্যাতিত ক'রে দেশছাড়া পর্য্যন্ত করেছে। তারপর পরিস্থিতিই যুদ্ধকে অনিবার্য্য করে তুলল। তবুও যুদ্ধের সময় রসুলাল্লা (সঃ) নিজে কখনও আক্রমণকারীর ভূমিকা নেননি।

দয়ালগুরুর চরিত্র এমনই হ'য়ে থাকে। কিন্তু আমরা তা' বুঝতাম না, জানতাম না কোনদিন। জানিয়ে দিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। অনেক বিস্ময়কর প্রতিভা আমরা দেখেছি, শুনেছি অনেক চমৎকৃত করার মত মেধা ও ধীশক্তির কথা, অনেক কূট রাজনীতিবিদ্ বা মানুষের মনের অতলের কথা টেনে বের করতে পারেন এমন সাহিত্য-স্রষ্টাকে আমরা হয়তো দেখেছি। কিন্তু দেখা ছিল না—ভগবত্তার সার্থক রূপ, সর্বজ্ঞান সমাহারী এক প্রেমিক ব্যক্তিত্ব, জীবনপিয়াসী কল্যাণযাজ্ঞিক দরদী মহামানব, সর্বস্তরের মানুষের তথা জীবজগতের পরম আশ্রয়। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই দেখেছি এসবের এক সার্থক রূপায়ণ। তাঁর চরণাশ্রয় ক'রেই পূর্ব পূর্ব প্রেরিত-পুরুষোত্তমগণের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে শিখেছি, জেনেছি তাঁদের বাণীর যথার্থ দ্যোতনা।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। হিন্দু ও মুসলমান এখানে পাশাপাশি বাস করে। কিন্তু ধর্ম্মীয় জীবনের দিক দিয়ে পরস্পরের জানাশুনা এখানে খুবই কম। আবার, যে আচার-আচরণ বা শরিয়ত এই দুই সম্প্রদায় মেনে চলেন, কালপ্রবাহে সেগুলির মধ্যে অনেক বিকৃতি প্রবেশ করেছে।

যে পটভূমিকায় কোন বিশেষ নীতি প্রবর্ত্তনের দরকার হয়েছিল, পটভূমিকা পরিবর্ত্তিত হ'লেও যদি সেই নীতির যুগোপযোগী ও স্থানোপযোগী সংশোধন ও বিবর্ত্তন না হয়, তখন সেই নীতির কার্য্যকারিতা আর ঠিকমত পরিলক্ষিত হয় না। এইভাবে ধর্ম্মাচার হয় গ্লানিযুক্ত। তখন আবার প্রেরিতপুরুষোত্তমের নব-কলেবরের আবির্ভাব হ'য়ে থাকে। তিনি দয়ালগুরু—জীবজগতের রক্ষাকর্তা। মানুষ অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির জন্য যে কষ্ট পায়, তা' থেকে মুক্ত ক'রে তিনি তাকে রক্ষা করেন।

আজ এই সমস্যাবিক্ষুব্ধ হিংসাশ্রয়ী দুনিয়ায় যদি শান্তি ও সমাধানের বাণী আনতে হয়, তাহ'লে চাই দয়াল-পুরুষের চরণাশ্রয়। আর, চরণাশ্রয় মানে চলনাশ্রয়। যে চলনে তিনি সবাইকে চলতে শিখিয়েছেন, যে নিয়মে সবাইকে ভালবাসতে ও আপন ক'রে নিতে প্রবুদ্ধ করেছেন, সেই বিধি ও নীতি অবলম্বন ক'রে চলতে হবে। মানুষ ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে না উঠলে তাকে অনিষ্টকেন্দ্রিক হ'তেই হবে। মধ্যপন্থা কিছু নেই। আর ইষ্ট হ'তে পারেন একমাত্র দয়ালগুরু, আর কেউ নয়। তিনি মঙ্গলের মূর্ত্ত প্রতীক। যদি কখনও পৃথিবীর এমন দুর্দ্দিন আসে, যখন কোন দয়াল পুরুষ নরদেহে বর্তমান থাকেন না, তখন অব্যবহিত পূর্বের যিনি তিনিই উপাস্য, ধ্যেয়, অনুসরণীয়। কারণ, সব থেকে শেষে এসেছেন যে ঐশী পুরুষ তাঁরই মধ্যে পূর্ববর্তী সকলেই পূর্ণ মহিমায় প্রকট হ'য়ে থাকেন। তাঁকে ধ'রেই, তাঁরই চলন অনুসরণ ক'রে পূর্ববর্ত্তী প্রেরিতদের জানা যায়, বোঝা যায় তাঁদের কথার তাৎপর্য্য। সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিন্ন যা'-কিছু সব এক ভূমায়িত সঙ্গতিশালিন্যে উপনীত হ'য়ে মানুষের বোধিকে সুপথে পরিচালিত হ'তে সহায়তা করে। তাই দয়ালই শরণ্য, দয়ালই বরেণ্য দয়ালই চির-অতন্দ্র পরমবান্ধব।

(২)

এ বিশ্বভুবনে অসংখ্য সব রত্ন চারিদিকে ছড়ানো আছে। বিশ্বপিতা

যখন নররূপে এই ধরাধামে আবির্ভূত হন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণার্থে সেই রত্নরাজি অজানার গহ্বর থেকে বের ক'রে আলোকে প্রকাশিত ক'রে দেন। যারা ধরতে পারে তারা সেই সব সম্পদ নিয়ে কাজে লাগায়। নিজেরাও উপকৃত হয়, সমাজেরও মঙ্গলসাধন করে।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর সারাটি জীবনকাল ধ'রেই জীবনধর্ম্মের নানা দিক, বিজ্ঞানের নানা বিভাগ, শাস্ত্রের নানা গূঢ় তত্ত্ব, ব্যবহারের বহু বিষয় ইত্যাদি একে একে উন্মোচন করেছেন। আর এইভাবে উন্মোচন করতে যেয়ে বস্তু বা বিষয়ের এক একটি প্রান্ত এমন আলোকিত হয়ে উঠেছে যে, সেই ব্যাপারে মানুষের সন্দেহ বা সমস্যা দূর হ'য়ে গেছে, চিন্তাজগতের একটা নতুন দিক খুলে গেছে।

ইংরাজী ১৯৬১ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর এই দীন সেবককে আদেশ করলেন কোরান-শরিফের সাথে হিন্দুমতের তথা হিন্দুশাস্ত্রের সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য কোথায় কোথায় তা' খুঁজে বের করতে হবে। চ'লল হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ ও ইসলাম-শাস্ত্রগ্রন্থাদির তুলনাত্মক এক বিপুল পঠন-পাঠন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই কর্ম্মের সুসম্পাদনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এই দুই মতের বহু দুর্লভ গ্রন্থ আনিয়ে দিলেন। বই আসতে লাগল কলকাতা থেকে, বেনারস থেকে, দিল্লী থেকে, সুদূর বোম্বাই থেকে। পবিত্র কোরানের অর্থবোধ সহজ করার জন্য কায়রো (মিশর) থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর আনিয়ে দিলেন একটি মহামূল্যবান আরবী-ইংরাজী অভিধান।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র আদেশ বাস্তবায়িত করার ধান্ধা নিয়ে যখনই যে তৎপর হ'য়ে উঠেছে, তখন তার যেসব উপকরণ দরকার হয়েছে, সবই তিনি দয়া ক'রে পাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। ভাবগ্রাহী জনার্দন তিনি। মানুষের অন্তরের আবেগ ও ভাব তাঁর অজ্ঞাত নয়। কোন কাজের আদেশ তিনি যখনই করেছেন,

তখন আগ্রহী অন্তঃকরণ যাতে তা' সম্পূর্ণ করতে পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও তিনি ক'রে রাখেন। কেবল একটু হাত-পা নেড়ে সেটা খুঁজে নিতে হয়।

দীর্ঘকাল কঠিন গবেষণার ভিতর দিয়ে দেখা গেল, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা নির্ভুল। ইসলাম ও হিন্দুমতের মূল নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রবর্ত্তিত বিধানসমূহ আর্য্যকৃষ্টির মূল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের মূল নীতির সাথে হিন্দুমতের মিল করার প্রচেষ্টায় দেখতে পেলাম, হিন্দুয়ানীর ব্যবহারিক আচার-বিচারের সাথে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও আর্য্যকৃষ্টির মূল নীতির সাথে ইসলামের মূল নীতি অভিন্ন। হিন্দুত্বও আর্য্যকৃষ্টি থেকেই জাত।

আর্য্যকৃষ্টি এক ব্রহ্মকে স্বীকার করে। ইসলামের কথাও 'এক ঈশ্বর ছাড়া উপাস্য নেই' (লা ইলাহা ইল্লালাহ)। শ্রীশ্রীঠাকুর সপ্তার্চির মধ্যে বললেন—ব্রহ্ম ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় (নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্)। ইসলাম পূর্ব্বতন প্রেরিতদের মধ্যে ভেদ করে না। শ্রীশ্রীঠাকুর সপ্তার্চির মাধ্যমে আমাদের জানালেন, তাঁর বার্তাবহ তথাগতগণ অভিন্ন (তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ)।

ইসলামের পাঁচ কালেমার সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রবর্ত্তিত পঞ্চবর্হির মিল পাওয়া যায়। ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত— কালেমা, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ্ব।

নামাজ (তুলনীয়ঃ বৈদিক 'নমস্') হল প্রার্থনা। যেখানে যে-অবস্থাতেই একজন মুসলিম থাকুন না কেন, যথাসময়ে প্রার্থনা করা তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "যেথায় থাকিস্ হোস্ না বেহুঁশ

করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা"। আর্য্যকৃষ্টিতে সন্ধ্যা প্রার্থনা যথাকালে করার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া আছে।

সাধারণভাবে সকলেরই সন্ধ্যা-আহ্নিক করণীয়, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের বিধানের অর্থাৎ সৎসঙ্গের নীতির সাথে ইসলামের কয়েকটা জায়গায় বেশী মিল পাওয়া যায়। যেমন ইসলামে প্রার্থনার আগে সবাইকে আহ্বান করা হয় উচ্চকণ্ঠে, তার নাম 'আজান'। সৎসঙ্গে প্রার্থনার আগে উচ্চৈঃস্বরে দেওয়া হয় 'আবাহনী'। ইসলামে সমবেত প্রার্থনার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া আছে। সৎসঙ্গ সমবেত প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বলে। কোন কারণে সমবেতভাবে না পারলেও একক প্রার্থনা অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে দুই মতই সমান।

জাকাত হ'ল ধর্মার্থে দান। এরকম দান আরো কয়েক প্রকার আছে, যাদের নাম ছদ্‌কা, ফেত্‌রা প্রভৃতি। এই জিনিসটি শ্রীশ্রীঠাকুর দিলেন ইষ্টভৃতি নামে, যার অর্থ মঙ্গলের ভরণ-পোষণ। আর যেখানে ধর্ম, মঙ্গল যেখানেই।

রোজা হ'ল ঈশ্বরার্থে উপবাসে থাকা। হিন্দুমতে নানা পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে উপবাস থাকার কথা তো আছেই। তা ছাড়া প্রায়শ্চিত্তাদি-কালেও উপবাস করার কথা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিধানে জীবন ও বৃদ্ধির ষট্‌স্তম্ভের মধ্যে "প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার কোন পবিত্র দিনে স্বল্পপরিমিত হবিষ্যাশী হইয়া বাকী দিন-রাত্রি উপবাসী" থাকার কথা আছে।

জীবনে অন্ততঃ একবার নবীপ্রবর হজরত মহম্মদের (সঃ) পুণ্য পদরজস্পৃষ্ট মক্কাভূমিতে গমন ক'রে যেখানে অভিবাদন জানাবার নাম হজ্ব। তীর্থে গমন, তীর্থদেবতার স্মরণ-মনন ও তীর্থভূমিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, হিন্দুশাস্ত্রের একটি বিশেষ অঙ্গ। শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রবর্ত্তিত জীবন ও বৃদ্ধির

ষট্‌স্তম্ভে আমরা দেখতে পাই "প্রতি বৎসর..... অন্ততঃপক্ষেএকবার তোমার আদর্শ ঈপ্সিত প্রিয়পরমের বাসস্থানে স্বশরীরী নতজানু উৎফুল্ল অভিবাদন দিতে কিছুতেই তাচ্ছিল্য করিও না।" এ যেন সেই দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার হজ্‌বিধানেরই যুগোপযোগী নবরূপায়ণ।

আর, ইসলামের প্রধান কালেমার মূল কথাই হ'ল—এক ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং হজরত মহম্মদকে (সঃ) জানতে হবে ঈশ্বরের প্রেরিত ব'লে। রসুলের মাধ্যমে আল্লার উপাসনা করতে হবে—রসুল-প্রবর্ত্তিত বিধান-অনুযায়ী। আর্য্যশাস্ত্র বলেন, গুরুরূপ বেদীর উপরে ঈশ্বরারাধনার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন, "আমাদের গন্তব্য হ'ল ঈশ্বরপ্রাপ্তি।" আর, ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য চাই অচ্যুত ইষ্টকেন্দ্রিকতা। গুরুমুখিনতার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরমুখী হ'য়ে ওঠা—সব প্রেরিতেরই এই একই কথা। সাধনার ভিত্তিই এই।

আর্য্যশাস্ত্র প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং ইসলাম-শাস্ত্র প্রধানতঃ আরবী ভাষায় লেখা। ভাষার এই একটা বিরাট ব্যবধান অনেক সময় আমাদের পরস্পরকে বুঝতে বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ভাষার ব্যবধানটা কোনরকম ঘুচিয়ে দিতে পারলেই দেখা যাবে, একজন মুসলিম এবং একজন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পূজারী ও মুয়াজ্জিন একই, ম্লেচ্ছ যা' কাফেরও তাই, মুরিদ ও শিষ্য সমানার্থক, মহাবিরাটই যে আলম-ই-কবীর, এই বোধ তখন পাকা হ'য়ে উঠবে। তখন যে যে-ভাষাতেই বলুক, দেখা যাবে, একই কথা বলছে।

অন্যান্য আচার-আচরণ সম্বন্ধে কথা হ'ল, দেড় হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে সবরকম পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, তার কিছু রকমারি অন্যত্র হতে পারে। তৎকালীন শেষ নবীকে পরিপূরণ ক'রে পরবর্ত্তী যিনি আসেন, তিনি দেশ, কাল ও পাত্র-অনুযায়ী

কিছু নতুন ব্যবস্থা এর মধ্যে আনতে পারেন। সেটা নবীকে অস্বীকার করা নয়, বরং তাঁকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা আরোতরভাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে এই দুটি ধারা যেন এক সমন্বয়ী সার্থকতা লাভ ক'রে মহীয়ান হ'য়ে উঠেছে। তাঁকে ধ'রেই ইসলামকে যথার্থভাবে বুঝতে ও জানতে পারলাম, একথা ধ্রুবসত্য। জানতে পারলাম মহানবী হজরত মহম্মদের (সঃ) প্রকৃত স্বরূপ। যত দেখেছি তত মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুর যত ভিতরে নিয়ে গেছেন, তত অনুভব করেছি এর মাধুর্য্য, এর সৌন্দর্য্য। মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ কত ভুল করে, বিনা কারণে কত জঘন্য ব্যবহার করে ও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাও বুঝতে পেরেছি।

এমনভাবে বস্তু ও বিষয়ের সবটা দেখাতে ও জানাতে, মানুষকে এমনভাবে ভালবাসতে ও ভালবাসাতে আর কাউকে দেখিনি। তাইতো এ হৃদয়-মন বারংবার লুটিয়ে পড়তে চায় তাঁরই শ্রীচরণপ্রান্তে। অজ্ঞান-তিমির তাঁরই পুণ্য প্রভায় বিদূরিত হয়েছে, তাইতো তিনি দয়ালগুরু—জীবনপথের কাণ্ডারী।

ইসলাম ও হিন্দুত্বের এই বিরাট তুলনামূলক গবেষণায় তিনি যে কী চেয়েছেন, তা' বিধৃত আছে "বেদদীপ্ত কোরান-শরিফ" নামক বিপুলায়তন গ্রন্থে। যথাসময়ে তা' মুদ্রিত হ'য়ে প্রকাশিত হবে। সমস্ত কথা সল্পপরিসর স্থানে আলোচনা করা অসম্ভব। আর, শুধুই এই একটা দিক নয়, জীবনের এরকম অসংখ্য প্রান্ত তাঁরই জগৎপাবী কিরণচ্ছটায় আলোকোদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। প্রাণধর্মের এক বিপুল বন্যায় পৃথিবী পরিপ্লাবিত করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তাইতো সেই তমসার পার মহান পুরুষের দিকে তাকিয়ে বার বার বলতে ইচ্ছা হয়—"তস্মাৎ তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ।"

বেদদীপ্ত কোরান-শরিফের পরিচায়িকা

যে জগৎপাবী করুণালোকচ্ছটা ভূমণ্ডলের স্থানবিশেষকে মাঝে মাঝে ভাস্কর ক'রে তোলে এবং ধীরে ধীরে সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ ঐ আলোকে আলোকিত হ'য়ে গণমানসে এক বিপুল বিশ্বচেতনার জাগরণ ঘটায়, আজ হ'তে সার্দ্ধ এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভূখণ্ডও তেমনই এক দিব্য দ্যুতিতে জ্যোতিষ্মান হ'য়ে উঠেছিল। আরব-মরুর বক্ষ আন্দোলিত ক'রে ফুটে উঠেছিল মহম্মদ (সঃ) রূপী এক অদৃষ্টপূর্ব্ব কোকনদ, যার মধুর সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত হয়েছিল সুরভিত।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র আরবদেশ ধর্ম্মের গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সত্য, সততা, সতীত্ব নিয়ে সেখানে ছিনিমিনি খেলা হ'ত। মানুষের জীবন একটা কীটের জীবনের চাইতে বেশী মূল্যবান ছিল না। কলহ, অনাচার, অত্যাচারের দাবদাহে সমগ্র আরব যেন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে চলেছিল। মানুষের ধন-মান-প্রাণ-নিরাপত্তা এক কুটিল আবর্ত্তে খড়কুটোর মত ভেসে চলেছিল। এমনতর জঘন্য পরিবেশে পুণ্য কাবা-পূজাগৃহের পবিত্র পুরোহিত বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন আরবের তথা জগতের তৎকালীন মুক্তিদাতা হজরত মহম্মদ (সঃ)।

শুধু আরবেই নয়, জগতের যেখানে যখনই ধর্ম্মের বিকৃতি উপস্থিত হয়েছে, সত্তাবিরোধী প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের সগর্ব্ব-কুর্দ্দন সুরু হয়েছে, জীবজীবনধাতা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ ক'রে তথাকথিত আচার-অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ ব'লে পরিগণিত হয়েছে, কল্যাণের নামে অকল্যাণই পূজা আসন লাভ করেছে, তখনই সেখানে আবির্ভূত হয়েছেন একজন পাবক-পুরুষ বা বিধায়ক-পুরুষ বা পুরুষোত্তম। সম্প্রদায়-বিশেষ, জাতিবিশেষ বা দেশবিশেষে আবির্ভূত হ'লেও তাঁরা শুধু সেইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তাঁরা তা' থাকেনও না। তাঁদের পুণ্য প্রভাব পরিব্যাপ্ত হ'য়ে

পড়ে দেশ হ'তে দেশান্তরে, কাল হ'তে কালান্তরে। এঁরাই ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ, নবী রসুল, Messiha; এঁরাই জীব-জীবনের পরমহোতা, সৃষ্টির অপূর্ব্ব বিস্ময়, কল্যাণের জীবন্ত দেবতা। মানুষের মাঝে অতিসাধারণ মানুষের মত হয়ে এঁরা আসেন, যাতে সবার সাথেই এঁদের যোগসূত্র স্থাপিত হ'তে পারে। এমনতর মানুষই ছিলেন হজরত এবরাহিম, হজরত মুসা, পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রভু বুদ্ধদেব, লোকত্রাতা যীশুখৃষ্ট। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে এই ধারারই উজ্জ্বল জোতিষ্ক প্রকট হয়েছিলেন আরবে হজরত রসুলাল্লা মোহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ) রূপে।

এইসব প্রেরিতপুরুষ যে-দেশে আসেন, যেখানকারই ভাষা ও বেশভূষা ব্যবহার করলেও তাঁদের আবেদন হ'য়ে থাকে বিশ্বমানবতার জন্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকথিত গীতা, প্রভু যীশুর উচ্চারিত বাইবেল এবং হজরত রসুলের (সঃ) শ্রীমুখ-নিঃসৃত কোরান-শরিফ এই তিনের ভাষা ও কাল পৃথক হলেও, এদের মূল উদ্দেশ্য একই। সকল ধর্ম্মগ্রন্থই মানুষকে আচার্য্যমুখী হ'য়ে ঈশ্বরপরায়ণ হ'য়ে ওঠার পথনির্দ্দেশ দান করে। আর, আচার্য্য মানেই যিনি আচরণ ক'রে সব কিছু জেনেছেন। এই ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে লিখিত বাণীসমূহ সেই সেই প্রেরিত পুরুষেরই বাণী। কিন্তু এই বাণীগুলি সাধারণ লোকের সহজ অবস্থায় প্রদত্ত উপদেশের মতন কথা নয়। প্রেরিতপুরুষগণ যখন ঈশ্বরসমাধির এক দিব্য ভাবাবস্থায় বিরাজ করেন, তখন তাঁদের নির্ম্মল-চৈতন্যের মর্ম্মমূল ঐশী চেতনায় পরিস্পন্দিত হতে থাকে। আর, সেই সাত্বত সুরই স্বরের মাধ্যমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে নির্গত হয় বাণীরূপে। তাই, ভাবে, ভাষায়, ছন্দে এগুলি অতুলনীয়। এমনতর অবস্থাতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রেরিতগণের "তিনি" উক্তি "আমি"-তে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। কথার ভিতর দিয়েই জানিয়ে

হৃদয়ে ঐশী প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে। সুদীর্ঘ দেড় হাজার বৎসর ধ'রে এই কোরান-শরিফ বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে, অসংখ্য তফসীর বা টীকা একে নানাভাবে বুঝতে ও ভাবতে সহায়তা করেছে। একে নির্ভুলভাবে জানবার ও বুঝবার জন্য পৃথকভাবে বিশেষ প্রকারের অভিধানও রচিত হয়েছে। এতসব থাকা সত্ত্বেও কেন আবার নূতন ক'রে কোরান-শরিফের এই বর্ত্তমান ভাষ্য লেখার প্রচেষ্টা ? কোরান-শরিফের যথার্থ অর্থ বোধের জন্য বহু ভাষ্য ও শব্দার্থ রচিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এই বর্ত্তমান নিবেদনের লক্ষ্য—ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোরান-শরিফের বাণীর আশ্রয়ে প্রীতি-সংহতি স্থাপন করা, প্রেরিতগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রস্ফুটিত ক'রে তোলা, বর্ত্তমান প্রেরিত যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণেরই নব অবতরণ তা' প্রদর্শন করা, বিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় যুক্তি সহকারে কোরান-শরিফের বাণীগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য উন্মোচিত করা এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করা, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে কোরান-শরিফের উপযোগিতা সুপ্রমাণিত করা, ভ্রান্তির কুহকে প'ড়ে মানব-চিত্ত যা'তে বিষাদক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত না হয়, সেজন্য তা'কে আচার্য্যকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার পথের সন্ধান দান করার চেষ্টা করা। এই লক্ষ্যে উপনীত হ'তে গিয়ে ইসলামশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক দেখেছি। আর্য্য হিন্দুশাস্ত্রের নানা বিষয় পর্য্যালোচনা করেছি। পরমপূজনীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণের অভিমতসমূহ নিষ্ঠাসহকারে অনুধাবন করেছি। সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্ত্তনবাদের সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারগুলিকে নিরীক্ষণ করেছি। প্রেরিতপুরুষের আগমনকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঐ মহান আগমনের ফলাফলও বিচার ক'রে দেখেছি। এই চিন্তাধারার পরিণামফলই বর্ত্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ-

১) প্রধানতঃ আমি মোঃ আবদুল হাকিম ও মোঃ আলি হাসানের কৃত কোরান-শরিফের বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করেছি।

২) আয়াতস্থিত শব্দগুলিকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। এই ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে দেখা গেছে ভারতীয় আর্য্য-চিন্তাধারা ও ইসলাম-ভাবধারা মূলতঃ এক। তথাকথিত সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই দুটি মতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ান হয়েছে।

৩) কোরান-শরিফ চায় মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হোক, স্বীয় আচার্য্যে সুনিষ্ঠ থেকে অন্য প্রেরিত ও ধর্ম্মমতকে সবাই শ্রদ্ধা করুক, মানুষ সৎ-কর্ম্মনিরত হোক এবং অসৎকে সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করুক, প্রেরিতনির্দ্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান নিত্য প্রতিপালনের ভিতর দিয়ে সকলে দেবচরিত্রের অধিকারী হোক। কোরান-শরিফের আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এই মূল তত্ত্বগুলিকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলার চেষ্টা করেছি।

৪) বক্তব্য অংশটি সামগ্রিকভাবে সুবোধ্য করার জন্য আমি অনেক জায়গায় দুই বা ততোধিক আয়াত একত্র যুক্ত ক'রে লিখেছি। অবশ্য এর জন্য বক্তব্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাতে কোথাও না হয়, সেদিকে আপ্রাণ লক্ষ্য রেখেই কাজ করেছি।

৫) যদি কোন আয়াতের ভাবার্থ পূর্ব্বের কোন ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হয়েছে বলে বোঝা যায়, তবে সেখানে ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি না ক'রে পূর্ব্বলিখিত ব্যাখ্যাটিই দেখার নির্দ্দেশ দান করা হয়েছে।

৬) কোরান-শরিফের "প্যারা" বিভাগের মধ্যে না যেয়ে আমি

শুধু "সুরা" "রুকু" বিভাগের মধ্যেই আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখেছি।

৭) এই কার্য্যকালে পবিত্র কোরানের প্রতিটি আয়াতের সমর্থন ও সমতাৎপর্য্যের বাক্য যে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়, তা' বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে থেকে উল্লেখ ক'রে সুপ্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছি। বর্ত্তমান গ্রন্থের পরম বিশেষত্ব এইটাই। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতিটি উদ্ধৃতিরই ধাত্বর্থমূলক বঙ্গানুবাদ সাথে সাথে দেওয়া আছে। স্থানবিশেষে একাধিক সমর্থনও প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতের ভাবার্থ এক হওয়ার জন্য কোথাও একই শাস্ত্রীয় সমর্থন পুনরাবৃত্ত হয়েছে। অবশ্য আমি সাধ্যমত এই পুনরুক্তি-দোষ এড়াতে চেষ্টা করেছি।

সাধারণ মানুষের পক্ষে পুরুষোত্তমের বাণীর বিচার করা ও তা'র ভাষ্য প্রণয়ন করা ধৃষ্টতামাত্র, তবে একমাত্র সেই পরমদয়ালেরই কৃপায় সকল অসম্ভব সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে। তবুও বামনের চাঁদ ধরবার মত আমার এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় যা'-কিছু সুন্দর, যা'-কিছু যথার্থরূপে পরিবেশিত, তা' তাঁরই অসীম কৃপাবলে সম্ভব হয়েছে, আর যতটুকু যা' অসমাপ্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি, তা'র দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার নিজস্ব।

কোরান-শরিফ রত্নাচলের কয়েকটি রত্ন

অন্যের জীবন রক্ষা ঃ....যে কাহারও জীবন রক্ষা করে, তবে সে যেন সমস্ত লোকের জীবনরক্ষা করিল,.....।—৫ ঃ ৩২

আহার্য্য ঃ

......যাহার উপর আল্লার নাম উচ্চারিত হইয়াছে তাহা হইতে ভক্ষণ কর।.... ।—৬ ঃ ১১৯

যাহার উপর আল্লার নাম উচ্চারিত না হয় তাহা ভক্ষণ করিও না এবং নিশ্চয় উহা দুষ্কার্য্য ; .....।—৬ ঃ ১২২

যিনি তোমাদের জন্য ভূমণ্ডলকে শয্যা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ পরিচালিত করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছেন, তদ্‌দ্বারা আমরা বিবিধ তরুলতা হইতে নানাবিধ খাদ্য উৎপন্ন করিয়া থাকি। তোমরা ভক্ষণ কর ও স্বীয়পালিত পশুদিগকে চারণ কর ; নিশ্চয় ইহার মধ্যে উপদেশ-গ্রাহিগণের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।।—২০ ঃ ৫৩-৫৪ ;

আমি তদ্‌দ্বারা (বারিবর্ষণ দ্বারা) তোমাদের জন্য খর্জ্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান উদগত করি ; তন্মধ্যে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলপুঞ্জ রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।—২৩ ঃ ১৯।

নিশ্চয় পালিত পশুকুলের মধ্যেও তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; আমি তোমাদিগকে উহার উদরে যাহা আছে তাহা হইতে পান করাই এবং তোমাদের জন্য উহাতে প্রচুর সুফল রহিয়াছে ; এবং উহা হইতেই তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।—২৩ ঃ ২১।

অতএব মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক। নিশ্চয় আমি সুবর্ষণে বারি বর্ষণ করিয়াছি ; তৎপর আমি ভূতলকে সুবিদারণে বিদীর্ণ করিয়াছি, পরে তন্মধ্যে শস্য উৎপাদন করিয়াছি। এবং আঙ্গুর ও শাকসব্জী ; এবং জৈতুন ও খর্জ্জুর ; এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ ; এবং ফল ও তৃণ ; উহা তোমাদের জন্য ও তোমাদের পশুসমূহের জন্য উপকারী।

—৮০ ঃ ২৪-৩২

ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য ঃ

তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ ; সেই সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই ।—২ ঃ ১৬৩ ।

ঈশ্বর ইচ্ছাময় ঃ

...আল্লার পথই সুপথ....... ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী । তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় করুণা নির্দ্দিষ্ট করেন ......।—৩ ঃ ৭৩-৭৪ ।

ঈশ্বর ও বিশ্বাসী ঃ

.......আল্লাহ্ বিশ্বাসিগণের প্রতি অনুগ্রহশীল ।—৩ ঃ ১৫২।

ঈশ্বর-করুণা ঃ

আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভারবিহীন করিতে ইচ্ছা করেন.....।৪ঃ ২৮।

ঈশ্বর মোটেই অত্যাচারী নন ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না.....।—৪ ঃ ৪০।

ঈশ্বর রক্তমাংস গ্রহণ করেন না ঃ

উহাদের মাংস অথবা উহাদের রক্ত কখনই আল্লার নিকট উপনীত হয় না, বরং তোমাদের সংযমই তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া থাকে....।—২২ ঃ ৩৭।

ঈশ্বরের কষ্টদান ঃ

আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেন না,...।—২ঃ২৮৬

ঈশ্বরের ভালবাসা ঃ

....আল্লাহ্ অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না ।— ৪ ঃ ৩৬

কেব্‌লা (ঈশ্বরোপাসনার দিক) ঃ

....পূর্ব্ব ও পশ্চিম আল্লারই জন্য....।—২ ঃ ১৪২ ।

দুইলোক অন্ধঃ

.... যে কেহ এখানে অন্ধ, বস্তুতঃ সে পরলোকেও অন্ধ হইবে এবং

সে নিতান্তই পথভ্রান্ত......।—১৭ঃ৭২।

দুগ্ধ ঃ

....নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুর মধ্যে শিক্ষাপ্রদ বিষয় রহিয়াছে ; আমি তাহাদিগকে উহাদের উদরের অন্তর্নিহিত গোময় ও শোণিতের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া থাকি— যাহা পানকারীদের জন্য তৃপ্তিকর ।—১৬ঃ৬৬।

ধর্ম্ম ও বলপ্রয়োগ ঃ

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল প্রয়োগ নাই ; ।—২ঃ২৫৬ ।

ধর্ম্মযুদ্ধঃ

.... যে আল্লার পথে যুদ্ধ করে, তৎপরে নিহত অথবা বিজয়ী হয়, তবে আমি তাহাকে মহান প্রতিদান প্রদান করিব ।—৪ ঃ৭৪।

ধর্ম্মসম্প্রদায় ঃ

নিশ্চয় তোমাদের এই ধর্ম্মসম্প্রদায় একই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর ।—২৩ঃ৫২।

নকল ধার্ম্মিকঃ

......যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করিও না ; তাহারা বলে—আমরা শান্তি স্থাপনকারী ব্যতীত নহি । সতর্ক হও !—নিশ্চয়ই তাহারাই অশান্তি-উৎপাদনকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না ।—২ঃ ১১-১২ ।

নবী স্নেহশীল ঃ

নবী বিশ্বাসিগণের উপর তাহাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহশীল এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীগণ তাহাদের জননীস্বরূপা ;....।—৩৩ঃ৬

নাম করা ঃ

...আল্লার জন্য উত্তম নামসকল আছে—অতএব তদ্দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান কর.....।—৭ঃ১৮০।

....তুমি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালককে স্বীয় অন্তরে

বিনীতভাবে ও সভয়ে এবং প্রকাশ্য স্বর ব্যতিরেকে স্মরণ কর এবং অমনোযোগীদের অন্তর্গত হইও না ।—৭ ঃ ২০৫।

নিষিদ্ধ খাদ্য ঃ

....মৃতজীব অথবা প্রবাহিত শোণিত কিংবা শূকর মাংস ভক্ষণকারীর জন্য ভক্ষণ অবৈধ করা হইয়াছে—যেহেতু উহা অপবিত্র,..... ।—৬ ঃ ১৪৬।

পরশ্রীকাতরতা ঃ

....তোমরা উহার আকঙ্ক্ষা করিও না, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন ; ।—৪ ঃ ৩২।

বিবাহ ঃ

....যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে নারীগণের মধ্য হইতে তোমাদের মনোমত দুইটি ও তিনটি ও চারিটিকে বিবাহ কর ; কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তবে মাত্র একটি...... ।—৪ ঃ ৩।

....তোমাদের পিতৃগণ নারীকুলের মধ্যে যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না ; —৪ ঃ ২২।

অপবিত্র নারীগণ অপবিত্র পুরুষদিগের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্রা নারীদিগের জন্য এবং পবিত্রা নারীগণ পবিত্র পুরুষদিগের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্রা নারীদিগের জন্য....... ।—২৪ ঃ ২৬।

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লার রসুলই উত্তম আদর্শ.... ।—৩৩ ঃ ২১।

রসুলানুগত্য ঃ

যে-কেহ রসুলের অনুগত হয়, নিশ্চয় সে আল্লারই অনুগত হইয়া থাকে ;...... ।—৪ ঃ ৮০।

নিশ্চয় যাহারা তোমার আনুগত্য স্বীকার করে, তাহারা এতদ্দ্বারা আল্লারই আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে ; ...... ।—৪৮ ঃ ১০।

রসুলে প্রভেদ নাই ঃ

....তাহাদের (রসুলদের) মধ্যে কাহাকেও আমরা প্রভেদ করি

না...।—২ঃ ১৩৬।

....আমরা তাঁহার রসুলগণের মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য করি না ; .....।—২ঃ ২৮৫।

....আমরা তাহাদের (রসুলদের) মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য জ্ঞান করি না ......।—৩ঃ ৮৪।

সদ্-আয় ও সদ্-ব্যয় ঃ

....পবিত্র বিষয় হইতে ব্যয় কর এবং উহা হইতে এরূপ কলুষিত বস্তু ব্যয় করিতে মনস্থ্ করিও না—যাহা তোমরা মুদ্রিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না ;......।—২ঃ ২৬৭।

সদ্ব্যবহার ঃ

আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পর শোণিতপাত করিবে না এবং স্বীয় বাসস্থান হইতে আপন ব্যক্তিদিগকে বহিষ্কৃত করিবে না ; তৎপরে তোমরা স্বীকৃত হইয়াছিলে এবং তোমরাই উহার সাক্ষী ছিলে ।—২ঃ ৮৪।

সাহায্য ঃ

হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ ; যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন.......।—৪৭ঃ ৭।

লেখকের বহুল প্রচারিত অন্যান্য পুস্তক

বিবাহ পরিচয়	—	১৫ টাকা
শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে দেবদেবী	—	২০ টাকা
শিশু কথা	—	২০ টাকা
ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ	—	১৫ টাকা
নববেদ বিধাতা	—	৪০ টাকা
নববেদায়ন	—	২৫ টাকা

সৎসঙ্গের সমস্ত স্টলে ও লেখকের নিকট পাওয়া যায়।

লেখক পরিচিতি

জন্ম ইং ১৯৩০ সালে খুলনা জেলা (অধুনা বাংলাদেশ)। ১৯৪৭ -এ ম্যাট্রিক পাশ। ১৯৪৮ -এ দীক্ষাগ্রহণ। ১৯৫২ -তে কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স-সহ স্নাতক, ঐ বৎসরেই পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আদেশে নিয়তকর্ম্মী হিসাবে আশ্রমে অবস্থিতি। পরে তাঁরই আদেশে আলোচনা প্রসঙ্গের লেখক শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাসের সহকারী রূপে কর্ম্মে নিযুক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন-গ্রন্থ 'দীপরক্ষী' – সংকলয়িতা। তাঁর ব্যবহৃত শব্দসমূহের অভিধান 'বাগর্থ দীপিকা'র রচয়িতা। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিধায়না সিরিজের বাণীগ্রন্থরাজি এবং আর্য্য প্রাতিমোক্ষ নামক মহাগ্রন্থের সংকলক। বিবাহ-পরিচয়, শিশুকথা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণেতা